KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. KLMLGK 2007	Place of Publication ৮১ নং বাহির মির্জাপুর
Collection KLMLGK	Publisher শরৎচন্দ্র ঘোষ
Title বিভব	Size 5.5" X 9" 13.97 X 22.86 c.m.
Vol. & Number ১/১ ১/৫ ১/৬	Year of Publication : আশ্বিন, ১২৭৪ মাঘ, ১২৭৪ ফাল্গুন, ১২৭৪ Condition : Brittle / Good ✓
Editor : প্রমথনাথ মিত্র	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

১৮ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট নিউ বৃটানিয়া যন্ত্রে
শ্রীঅম্বিকাচরণ সোম দ্বারা মুদ্রিত।

১ম ভাগ। ১২৯৪ মাঘ ৫ম সংখ্যা।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বিভা।

শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক
কলিকাতা ৬১ নং বাহির শ্যামবাজার হইতে প্রকাশিত।

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
সনাতন ধর্ম্ম ...	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ...	১৯৩
মহাকাব্যের পরিচয়	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু ...	২০১
রাধাসুন্দরী ...	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু ...	২১২
কলিকাতার জল বায়ু	শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ দত্ত ...	২১৪
রাখাল বালকের গীত	শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জ মুখোপাধ্যায় ...	২১৯
বাল্য বিবাহ ...	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ...	২২০
প্রভাত সঙ্গীত ...	শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ঘোষ ...	২৩৮
সমালোচনা ...		২৩৯

বিজ্ঞাপন।

ষ্টার থিয়াটারে অভিনিত গিরিশ বাবুর

রূপ-সনাতন।

মূল্য এক টাকা।

৭৮নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট নিউ বৃটানিয়া প্রেস ডিপজিটারি—ও ৬১ নং বাহির শ্যামবাজার "বিভা" অফিসে পাওয়া যায়।

"নবজীবন" ও সাধারনী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার বি এল, মহাশয় প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমাদিগের নিকট পাওয়া যায়।

সমাজ সমালোচন (প্রাবু ও উদ্দীপনা)	॥০
গোচারণের মাঠ	৶০
সংক্ষিপ্ত রামায়ণ	৶০
আলোচনা	॥৶০
শিক্ষা-নবিশের পদ্য	।৶০
হাতে হাতে ফল (বঙ্গবিলাস সমজদার)	।৶০

অক্ষয় বাবু একজন বঙ্গসাহিত্যের প্রধান লেখক। তাঁহার পুস্তকের গুণগরিমার আর অধিক পরিচয় দিবার প্রয়োজন করে না। ...

নিউ ব্রিটানিয়া প্রেস ডিপজিটারি ৭৮নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, নবজীবন আফিস ৬১নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট ও বিভা অফিস ৬১নং বাহির শ্যামবাজার কলিকাতা।

বিভা সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের মত।

"বিভা। মাসিক পত্রিকা। পত্রিকার উপর সম্পাদকের নাই ; ইহার প্রকাশকালেও চারি দিকে দুন্দুভিধ্বনি হয় নাই। নাই হউক তাহাতে ক্ষতি নাই, ইহা নিজগুণে সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই আদরের বস্তু হইবে. সন্দেহ নাই। এখানি প্রথম শ্রেণীর মাসিক

বিভা।

[৫ম সংখ্যা সন ১২৯৪ সাল ১ম খণ্ড]

সনাতন ধর্ম্ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রণবের স্বরূপ ও প্রণব হইতে জগতের সৃষ্টি।

কথিত আছে, প্রণবই বেদের বীজ এবং প্রণবই জগতের উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ। আমরা যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই প্রণবের সপ্ত অঙ্গ লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রণব ভিন্ন অপর কোন বস্তুই ব্রহ্মাণ্ডে লক্ষিত হয় না। এই প্রণব হইতে যে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করিবার পূর্ব্বে প্রণবের স্বরূপ কি, তাহা স্থুল রূপে এক প্রকার নিরূপণ করা যাইতেছে। প্রকৃত প্রণবের স্বরূপ জগৎ সৃষ্টি কথনানন্তর পশ্চাৎ যথাস্থানে সূক্ষ্মরূপে প্রদর্শিত হইবে। কথিত আছে যে ;—

"সপ্তাঙ্গঞ্চ চতুষ্পাদং ত্রিস্থানং পঞ্চদৈবতম্।
ওঁকারং যো ন জানাতি স কথং ব্রাহ্মণো ভবেৎ" ॥

যিনি সপ্ত অঙ্গ বিশিষ্ট চতুষ্পাদ বিশিষ্ট ত্রিস্থান বিশিষ্ট ও পঞ্চদেবতা স্বরূপ প্রণব না জানেন, তিনি কিরূপে ব্রাহ্মণ হইতে পারেন !! ফলত ব্রাহ্মণ মাত্রেরই প্রণবের অন্তর্গত সপ্ত অঙ্গ, চতুষ্পাদ, ত্রিস্থান ও পঞ্চ দেবতা, সমষ্টি ও ব্যষ্টি রূপে পরিজ্ঞাত থাকা আবশ্যক। ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ এই যে, যিনি ব্রহ্ম অর্থাৎ ওঁকার (শব্দব্রহ্ম ও পরমব্রহ্ম) পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। মহাভারতে যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন ;—

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠাত্তবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ"।

মানবগণ জন্মকালে শূদ্রজাতি থাকে, যখন উপনয়নাদি সংস্কার হয়, তখন তাহাকে দ্বিজ বলা যায়। পরে তিনি যখন বেদ পাঠ করেন, তখন বিপ্রপদ-বাচ্য হয়েন। অনন্তর ব্রহ্ম (শব্দব্রহ্ম ও পরমব্রহ্ম) অর্থাৎ প্রণব পরিজ্ঞাত হইলে ব্রাহ্মণ হইতে পারেন।

মহাভারতে অঙ্গগরপ্রশ্নে আরও কথিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণতনয় যদি ব্রহ্মজ্ঞান-বিহীন হয়েন, তাহা হইলে তিনি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম এবং চণ্ডাল যদি ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে উত্তম ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে।

প্রণবের সপ্ত অঙ্গ যথা, (অ) অকার, (উ) উকার, (ম) মকার, (ং) নাদ, (ঃ) বিন্দু, (—) কলা এবং (=) কলাতীত। চতুষ্পাদ যথা, স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষী। ত্রিস্থান যথা, জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নাবস্থা ও সুষুপ্তাবস্থা। পঞ্চদেবতা যথা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও মহেশ্বর।

প্রণব তিন প্রকার যথা, অপরপ্রণব, পরপ্রণব ও মহাপ্রণব। অপর প্রণবও আবার তিন প্রকার, সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক। এই ত্রিবিধ প্রণবের স্বরূপ পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে। শব্দব্রহ্ম-স্বরূপ অপরপ্রণবে অকার দ্বারা রজোগুণ, উকার দ্বারা সত্বগুণ এবং মকার দ্বারা তমোগুণ লক্ষিত হইতেছে। নাদ শব্দের অর্থ বামা জ্যেষ্ঠা ও রৌদ্রী, এই তিন শক্তি। সাত্বিক শক্তিকে বামা, রাজসিক শক্তিকে জ্যেষ্ঠা ও তামসিক শক্তিকে রৌদ্রী বলা যায়। বিন্দুও তিন প্রকার, সাত্বিক বিন্দু, রাজসিক বিন্দু ও তামসিক বিন্দু। সাঙ্খ্যমতাব-লম্বীরা এই ত্রিবিধ বিন্দুকে সাত্বিক অহঙ্কার, রাজসিক অহঙ্কার ও তামসিক অহঙ্কার বলিয়া থাকেন। এই বিন্দুত্রয় হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন। প্রণবের ষষ্ঠ অঙ্গ কলা শব্দের অর্থ মহেশ্বররূপ তামসিক বিন্দু হইতে উৎপন্ন শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র এবং আকাশ বায়ু তেজ জল ও পৃথিবী, এই পঞ্চ ভূত এবং রাজসিক বিন্দুরূপ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন শব্দশক্তি, স্পর্শশক্তি, রূপশক্তি, রসশক্তি ও গন্ধশক্তি এবং বাক্ পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ, এই পাঞ্চভৌতিক পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং সাত্বিক বিন্দুরূপ বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, রসজ্ঞান ও গন্ধজ্ঞান এবং শ্রবণেন্দ্রিয়, ত্বগিন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়, এই পাঞ্চ-ভৌতিক জ্ঞানেন্দ্রিয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ও চিৎ, এই পঞ্চ ভাগে বিভক্ত অন্তঃকরণ, এতৎসমুদায়ই কলা শব্দে অভিহিত হইয়াথাকে। কলাতীত শব্দের অর্থ এতৎসমুদায়ে অনুপ্রবিষ্ট চৈতন্য।

অপর প্রণবের সপ্ত অঙ্গের ব্যাখ্যা করা হইল। এক্ষণে এই প্রণবের পাদচতুষ্টয় নিরূপণ করিতেছি। প্রত্যেক বস্তুতেই স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষী, এই চারিটি অবস্থা আছে। স্থূল-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যকে স্থূল বলে। যাহা স্থূল ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে, তাহা সূক্ষ্ম। গুণে স্থিত হইলে বীজ বলাযায়। নির্গুণ-অবস্থাপন্নকে সাক্ষী বলে। এই চারিটী অবস্থাকেই প্রণবের চতুষ্পাদ বলা যায়। ত্রিস্থান শব্দের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে, যথা, বিশ্ব অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং বিরা ট্‌অর্থাৎ জাগ্রদবস্থাভিমানী পুরুষ। ইহার সমষ্টি ও ব্যষ্টি প্রণবের প্রথম স্থান। হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় পরিদৃশ্য মান জগৎ এবং তৈজস অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থাভিমানী পুরুষ, ইহার সমষ্টি ও ব্যষ্টি, শব্দব্রহ্মরূপ প্রণবের দ্বিতীয় স্থান। অব্যাকৃত অর্থাৎ

সুষুপ্ত্যবস্থায় অনুভূয়মান অজ্ঞানাধিকৃত আনন্দ ও প্রাজ্ঞ অর্থাৎ সুষুপ্ত্যবস্থাভিমানী পুরুষ, ইহার সমষ্টি ও ব্যষ্টি প্রণবের তৃতীয় স্থান, সুতরাং জীবের সমষ্টির ও ব্যষ্টির এই তিন অবস্থাই শব্দব্রহ্মরূপ অপরপ্রণবের তিন স্থান। ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ঈশ্বর ও মহেশ্বর, এই পঞ্চ দেবতাই শব্দব্রহ্মরূপ প্রণবের স্বরূপ।

আমরা যেরূপ প্রণবের ব্যাখ্যা করিলাম, ইহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হয়, এরূপ বোধ হয় না। অনেকে ইহার মর্ম্ম ভেদ করিতে না পারিয়া উন্মত্তপ্রলাপের ন্যায় মনে করিতে পারেন, এজন্য প্রমাণ-প্রয়োগের সহিত বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। নিম্নে সদাশিবোক্ত তন্ত্র অনুসারে যে জগতের উৎপত্তি বিবরণ লিখিতেছি, তাহা পাঠ করিলেই শব্দব্রহ্মরূপ অপর-প্রণবের স্বরূপ ও সপ্তাঙ্গ প্রভৃতি পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে। সারদাতিলকে প্রথম পটলে কথিত আছে,—

"নির্গুণঃ সগুণশ্চেতি শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ।
নির্গুণঃ প্রকৃতেরন্যঃ সগুণঃ সকলঃ স্মৃতঃ।
সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্বিন্দুসমুদ্ভবঃ।

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমব্রহ্ম দুই প্রকার, সগুণ ও নির্গুণ এই পরমব্রহ্ম মায়াতে অনুপহিত থাকিলে তাঁহাকে নির্গুণ বলা যায়; তিনি মায়াতে উপহিত হইলে তাঁহাকে সগুণ ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমব্রহ্ম যখন কলামুক্ত হয়েন অর্থাৎ মূলপ্রকৃতিতে উপহিত থাকেন, তখন তাঁহা হইতে শক্তির আবির্ভাব হয় এবং ঐ আবি-ভূত শক্তি হইতে নাদ (মহত্তত্ত্ব) এবং নাদ হইতে বিন্দু (অহঙ্কারতত্ত্ব) উৎপন্ন হইয়া থাকে।

গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মের অবিনাভাব সম্বন্ধ। প্রকৃতি ব্যতি-রেকে ব্রহ্ম থাকেন না এবং ব্রহ্ম ব্যতিরেকে-ও প্রকৃতি থাকেন না; উভয়ে চণকাকারে একীভূত হইয়া আছেন। প্রকৃতির কর্তৃত্ব আছে, চৈতন্য নাই; ব্রহ্মের চৈতন্য আছে, কর্তৃত্ব নাই; উভয়ে একীভূত থাকাতে কর্তৃত্ব ও চৈতন্য অব্যাহত রহিয়াছে। ইঁহাকে কেহ প্রকৃতিযুক্ত চৈতন্য, কেহ বা চৈতন্যযুক্ত প্রকৃতি মনে করিয়া থাকেন। এই কারণে কেহ কেহ ইঁহাকে শিবস্বরূপ বা পুংদেবতা বলিয়া পূজা করেন, কেহ কেহ বা শক্তি-স্বরূপ ও স্ত্রীদেবতা বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন, কেহ কেহ বা ইঁহাকে নিরাকার ব্রহ্ম বলিয়া ধ্যান করেন। এইরূপে ইনি কাহারও নিকট পুরুষ, কাহারও নিকট স্ত্রী, কাহারও নিকট উভয়াত্মক, কাহারও নিকট স্ত্রীপুংভাবের অতীত বলিয়া পরিকল্পিত হইতেছেন। এই মূলপ্রকৃতিতে উপহিত চৈতন্য, বৈষ্ণবদিগের উপাস্য বিষ্ণু গোপাল কৃষ্ণ প্রভৃতি, শাক্তদিগের উপাস্য কালী তারা ত্রিপুরা প্রভৃতি শক্তি, সৌরদিগের উপাস্য সূর্য্য, শৈবদিগের উপাস্য শিব ও গাণপত্যদিগের উপাস্য গণপতি। বৈষ্ণ-বেরা বিষ্ণুতে, শাক্তেরা শক্তিতে, সৌরেরা সূর্য্যেতে, শৈবেরা শিবমূর্ত্তিতে ও গাণপ-ত্যেরা গণেশমূর্ত্তিতে এই মূলপ্রকৃতিযুক্ত চৈতন্যের অধিষ্ঠান ও আবির্ভাব কল্পনা

করিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা মূর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরাকার ধ্যান করেন। ফলত যাঁহারা সাকার উপাসনা করেন, যাঁহারা নিরাকার উপাসনা করেন, অথবা পৃথিবীতে যে কোন ব্যক্তি যে কোন দেবতার উপাসনা করেন, এই মূলপ্রকৃতিতে উপহিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেরই উপাসনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। এমন কি, যাঁহারা গুরুকে ব্রহ্মস্বরূপ ও মানবশরীরে তাঁহার অধিষ্ঠান কল্পনা করিয়া গুরুর আরাধনা করেন, তাঁহাদের পক্ষেও উক্ত মূলপ্রকৃতিতে উপহিত চৈতন্যের উপাসনা সিদ্ধ হয়।

এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলাম। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। যে সময় সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ সমভাগে মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে পরাভব করে, কোন গুণেরই প্রাদুর্ভাব থাকে না, তখন সেই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকেই মূলপ্রকৃতি বলা যায়। এ অবস্থায় মূলপ্রকৃতিতে কোন গুণ প্রকাশ না থাকাতে সমুদায় গুণই পরস্পর অভিভূত ও লয়প্রাপ্ত হওয়াতে ইহাঁকে নির্গুণ অবস্থাও বলা হইয়া থাকে।

মহাপ্রলয়ের অবসানে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম তাদাত্ম্য সম্বন্ধে কালে অধিষ্ঠান করিলে বসন্তকালে বসন্তকালীন পুষ্পের ন্যায়, তিল হইতে তৈলের ন্যায় এই চৈতন্যযুক্ত মূলপ্রকৃতি হইতে প্রথমত শক্তির আবির্ভাব হয়। এই শক্তি আদ্যাশক্তি নামে কথিত হইয়া থাকেন। এক প্রদীপ হইতে প্রজ্বালিত অন্য প্রদীপের ন্যায় এই আদ্যাশক্তিও মূলপ্রকৃতির রূপান্তর মাত্র। এই আদ্যাশক্তিও মূলপ্রকৃতির ন্যায় গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা ও সচ্চিদানন্দের সহিত একীভূত; পরন্তু মূলপ্রকৃতির সহিত ইঁহার এইমাত্র প্রভেদ যে, মূলপ্রকৃতি অবিকৃতি, ইঁহার বিকৃতি আছে। কালের সহকারিতায় অদৃষ্ট নিবন্ধন প্রথমত এই আদ্যাশক্তিতে গুণক্ষোভ হইয়া থাকে। তন্ত্রে কথিত আছে,—

"সৃষ্টিশ্চতুর্ব্বিধা দেবি প্রকৃত্যামনুবর্ত্ততে।
অদৃষ্টাজ্জায়তে সৃষ্টিঃ প্রথমে তু বরাননে।
বিবর্ত্তভাবে সম্প্রাপ্তে মানসী সৃষ্টিরুচ্যতে।
তৃতীয়ে বিকৃতিং প্রাপ্তে পরিণামাত্মিকা তথা।
আরম্ভসৃষ্টিশ্চ ততশ্চতুর্থে যৌগিকী প্রিয়ে।
ইদানীং শৃণু দেবেশি তত্ত্বঞ্চ বিশেষতঃ।
সৃষ্টিশ্চতুর্ব্বিধা দেবি যথাপূর্ব্বং সমাগতঃ॥

দেবি! প্রকৃতি হইতে চারি প্রকার সৃষ্টি হয়। প্রথমত অদৃষ্ট বশত জীবসমষ্টির ভোগকাল উপস্থিত হইলে যে সৃষ্টি হয়, তাহা প্রথম সৃষ্টি ও অদৃষ্টসৃষ্টি বলিয়া কথিত আছে। মূলপ্রকৃতি হইতে শক্তির আবির্ভাব ও গুণক্ষোভই এই প্রথম সৃষ্টি। বিবর্ত্তসৃষ্টিকে মানসী সৃষ্টি বলে। বেদান্তসারে কথিত আছে,—

"সতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ"॥

যে স্থলে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু উৎপন্ন হইবার সময় পূর্ব্ব বস্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে রূপান্তর হয়, তাহার নাম বিকার, যেমন দুগ্ধের বিকার দধি এবং শব্দতন্মাত্রাদির বিকার আকাশাদি। যে স্থলে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু উৎপন্ন হয়, অথচ পূর্ব্ববস্তুর অন্যথাভাব হয় না, তাহাকে

বিবর্ত্ত-সৃষ্টি বলা যায়। যখন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় তৎকালে মিথ্যাভূত সর্পের উৎপত্তি হয় বটে, কিন্তু রজ্জুর রজ্জুতা অব্যাহতই থাকে অর্থাৎ প্রকৃতপ্রস্তাবে রজ্জুর অন্যথাভাব হয় না। এইরূপ প্রকৃতিতে উপহিত ব্রহ্ম হইতে যে জগতের সৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব অব্যাহত রহিয়াছে, পরন্তু অঘটন-ঘটন—পটীয়সী মায়াদ্বারা পরিকল্পিত এই জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্তস্বরূপ; ইহা দ্বিতীয় সৃষ্টি ও মানসী সৃষ্টি বলিয়া অভিহিত হয়। এই সৃষ্ট পদার্থ যখন বিকৃতি প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হয় অর্থাৎ এক বস্তু রূপান্তর হইয়া সেই স্থানে অন্য বস্তু উৎপন্ন হইতে থাকে, তখন তাহাকে পরিণামসৃষ্টি বা তৃতীয় সৃষ্টি বলে।

মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ ভূতের উৎপত্তি এই পরিণামসৃষ্টি বা তৃতীয় সৃষ্টির অন্তর্গত। যখন পঞ্চীকৃত পরমাণু সমুদায়ের পরস্পর যোগ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি হইতে থাকে, তখন তাহাকে আরম্ভ-সৃষ্টি বা যৌগিকী সৃষ্টি বলা যায়। ইহা চতুর্থ সৃষ্টি। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে একমাত্র আরম্ভ সৃষ্টিরই উল্লেখ আছে, কারণ, তাঁহারা পরমাণুর নিত্যতা স্বীকার করেন। তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম পথে গমন করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই।

সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে যৌগিকসৃষ্টি ও পরিণাম-সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকার। ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম বিচার করিতে তাঁহাদের অধিকার নাই। বৈদান্তিকগণ যৌগিকসৃষ্টি, পরিণামসৃষ্টি ও বিবর্ত্তসৃষ্টি বর্ণন করিয়াছেন। তন্ত্রে যৌগিকসৃষ্টি, পরিণামসৃষ্টি, বিবর্ত্তসৃষ্টি ও অদৃষ্টসৃষ্টি এই চতুর্ব্বিধ সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং তন্ত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম পথে অগ্রসর হইতে কেহই সাহসী হয়েন নাই। এক্ষণে এই চতুর্ব্বিধ সৃষ্টির বিষয় বর্ণন করিতেছি।

অদৃষ্ট নিবন্ধন জীবসমষ্টির ভোগ কাল উপস্থিত হইলে যখন আদ্যাশক্তিতে (প্রকৃতিতে) গুণক্ষোভ হয়, তৎকালে প্রথমত তমোগুণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ঐ চৈতন্যযুক্ত শক্তিও ঐ তমোগুণে অনুপ্রবিষ্ট হয়েন। এই তমোগুণ মহাকাল শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। যৎকালে প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তৎকালে সত্ত্বগুণ রজোগুণে এবং রজোগুণ তমোগুণে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই তমোগুণও প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। তন্ত্রে যে কথিত আছে, আদ্যাকালী মহাকালকে প্রসব করিয়া তাহাতে উপগতা হয়েন অথবা বল পূর্ব্বক বিপরীত রতিতে প্রবৃত্তা হয়েন; তাহার তাৎপর্য্য এই যে, আদ্যাশক্তি হইতে আবির্ভূত তমোগুণে আদ্যাশক্তি অনুপ্রবিষ্টা হইতেছেন।

অনন্তর প্রকৃতির (আদ্যাশক্তির) গুণক্ষোভ হইলে তৎপ্রসূত মহাকাল সহকারে তাঁহা হইতে নাদের (মহত্তত্ত্বের) উৎপত্তি হয়। এই নাদ আবার সত্ত্ব রজ ও তম, এই তিন গুণ ভেদে ত্রিবিধ হইয়া থাকে। সাঙ্খ্যেরা এই ত্রিবিধ নাদকে তামসিক মহত্তত্ত্ব রাজসিক মহত্তত্ত্ব ও সাত্ত্বিক মহত্তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। শ্রুতি আছে যে,—

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে"।

অর্থাৎ প্রথমত হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। পশ্চাৎ তিনি গুণভেদে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন মূর্ত্তি হইয়াছেন, ইহার সহিত কোন বিরোধ হইতেছে না। প্রথমত গুণত্রয়ের সমষ্টিরূপ মহত্তত্বের উদ্ভব হইয়াছিল। পরে সেই মহত্তত্ব সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক এইতিন ভাগে বিভক্ত হইয়া সূক্ষ্মব্রহ্মা, সূক্ষ্মবিষ্ণু ও সূক্ষ্ম মহেশ্বর অথবা ঐ মূর্ত্তিত্রয়ের বীজ উৎপন্ন হইয়াছে। এই মহত্তত্ব বুদ্ধিতত্ত্ব শব্দেও অভিহিত হইয়াথাকে। অনন্তর ত্রিবিধ নাদ হইতে সাত্বিক বিন্দু রাজসিক বিন্দু ও তামসিক বিন্দু, এই ত্রিবিধ বিন্দুর উৎপত্তি হইয়াছে। বিন্দুশব্দের অর্থ যাহার দীর্ঘতা নাই, প্রস্থ নাই উচ্চতাও নাই, তাদৃশ বস্তু। সঙ্কেথ্যরা এই ত্রিবিধ বিন্দুকে সাত্বিক অহঙ্কার, রাজসিক অহঙ্কার ও তামসিক অহঙ্কার বলিয়া থাকেন। সারদাতিলকে কথিত আছে,—

"সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্বিন্দুসমুদ্ভবঃ।
পরশক্তিময়ঃ সাক্ষাৎ ত্রিধাসৌ ভিদ্যতে পুনঃ।
বিন্দুর্নাদো বীজমিতি তস্য ভেদাঃ সমীরিতাঃ।
বিন্দুঃ শিবাত্মকং বীজং শক্তিরূপং তয়োর্মিথঃ।
সমবায়ঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বাগমবিশারদৈঃ।
রৌদ্রী বিন্দোস্ততো নাদাৎ জ্যেষ্ঠা বীজাজ্জায়ত।
বামা তাভ্যঃ সমুৎপন্না রুদ্রব্রহ্মরমাধিপাঃ।
তে জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াত্মানো বহ্নীন্দ্বর্কস্বরূপিণঃ॥"

সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মযুক্ত আদ্যাশক্তি হইতে যে নাদ (মহত্তত্ব) উৎপন্ন হইয়াছে, সেই নাদ হইতে বিন্দুর (অহঙ্কারতত্ত্বের) উৎপত্তি হয়। পরশক্তিময় এই বিন্দু সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক, এই তিন ভাগে বিভক্ত। সাত্বিক বিন্দুর নাম বিন্দু, তামসিক বিন্দুর নাম বীজ এবং রাজসিক বিন্দুর নাম নাদ। এই তিনের যে সমষ্টি তিনি পরমবিন্দু শব্দে অভিহিত হয়েন। এই বিন্দু বীজ ও নাদের মধ্যে বিন্দু শিবস্বরূপ অর্থাৎ চিন্ময়। বীজ শক্তিস্বরূপ অর্থাৎ প্রকৃতিময় এবং নাদ শিবশক্তির সমবায় স্বরূপ। ফলত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে সত্ত্ব গুণ চিন্ময়, তমোগুণ প্রকৃতিময় এবং রজোগুণ উভয়াত্মক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

অনন্তর বিন্দু হইতে রৌদ্রী শক্তি, নাদ হইতে জ্যেষ্ঠা শক্তি এবং বীজ হইতে বামা শক্তি উৎপন্ন হইলেন। এই রৌদ্রী শক্তি হইতে রুদ্র, জ্যেষ্ঠা শক্তি হইতে ব্রহ্মা এবং বামা শক্তি হইতে বিষ্ণু উৎপন্ন হইয়াছেন। পূর্ব্বে যে ত্রিবিধ মহত্তত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এবং ত্রিবিধ বিন্দু, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের বীজমাত্র। এক্ষণে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর নিজ নিজ স্বরূপে পরিণত হইলেন।

এই রুদ্র জ্ঞান-শক্তি স্বরূপ, ব্রহ্মা ইচ্ছাশক্তি স্বরূপ ও বিষ্ণু ক্রিয়া-শক্তি স্বরূপ। রুদ্র বহ্নি-স্বরূপ হইয়া সংহার করেন, ব্রহ্মা চন্দ্র স্বরূপ হইয়া সৃষ্টি করেন এবং বিষ্ণু সূর্য্য স্বরূপ হইয়া জগতের পোষণ করিয়া থাকেন। ক্রিয়াসারে কথিত আছে,—

বিন্দুঃ শিবাত্মকস্তত্র বীজঃ শক্ত্যাত্মকঃ স্মৃতম্।
তয়োর্যোগে ভবেন্নাদস্তেভ্যো জাতাস্ত্রিশক্তয়ঃ।

বিন্দু শিবাত্মক, বীজ শক্ত্যাত্মক ও নাদ শিবশক্ত্যাত্মক। এই বিন্দু বীজও নাদ হইতে ত্রিশক্তি অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির উৎপত্তি হইয়াছে। এস্থলে রুদ্র

ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উল্লেখ নাই কারণ, তাঁহারা ঐ তিন শক্তি হইতে অভিন্ন। মূলপ্রকৃতির সহিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের যেরূপ কোন ভেদ নাই এবং উভয়ে যেরূপ তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া আছেন, সেই রূপ জ্ঞানশক্তির সহিত রুদ্র, ইচ্ছাশক্তির সহিত ব্রহ্মা এবং ক্রিয়াশক্তির সহিত বিষ্ণু তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। গোরক্ষসংহিতাতেও রুদ্র ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উল্লেখ না করিয়া তিন শক্তিমাত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে যথা,—

"ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী।
ত্রিধা শক্তিঃ স্থিতা লোকে তৎপরঃ শক্তিরোমিতি"॥

জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি, গৌরী, ব্রাহ্মী ও বৈষ্ণবী নামে বিখ্যাতা। এই তিন শক্তি হইতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইতেছে। এই তিন শক্তি প্রণব দ্বারা প্রতিপাদ্য। কুব্জিকাতন্ত্রে কথিত আছে;—

"ব্রহ্মাণী কুরুতে সৃষ্টিং ন তু ব্রহ্মা কদাচন।
অতএব মহেশানি ব্রহ্মা প্রেতো ন সংশয়ঃ॥
বৈষ্ণবী কুরুতে রক্ষাং ন তু বিষ্ণুঃ কদাচন।
অতএব মহেশানি বিষ্ণুঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ॥
রুদ্রাণী কুরুতে ত্রাসং ন তু রুদ্রঃ কদাচন।
অতএব মহেশানি রুদ্রঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাস্তা জড়াশ্চৈব প্রকীর্ত্তিতাঃ।
প্রকৃতিঞ্চ বিনা দেবি সর্ব্বে কার্য্যাক্ষমা ধ্রুবম্॥

ব্রহ্মাণী জগতের সৃষ্টি করিতেছেন, ব্রহ্মা কখনই সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়েন না, অতএব মহেশ্বরি! ব্রহ্মা শব, সন্দেহ নাই। বৈষ্ণবী শক্তি রক্ষা করিতেছেন, বিষ্ণু কখনই রক্ষা করিতে সমর্থ নহেন, অতএব মহেশ্বরি! বিষ্ণু প্রেত, সন্দেহ নাই। দেবি! রুদ্রাণী সংহার করিতেছেন, রুদ্র কখনই সংহার কার্য্যে সমর্থ হয়েন না, অতএব মহেশ্বরি! রুদ্রও শব সন্দেহ নাই। ফলত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি সকলেই জড়স্বরূপ কারণ, শক্তি ব্যতিরেকে কেহই কোন কার্য্য করিতে সমর্থ নহেন। বস্তুত শক্তিসমবেত ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, শক্তি সমবেত বিষ্ণু পালন করেন, শক্তিসমবেত রুদ্র সংহার করিয়া থাকেন; শক্তিব্যতিরেকে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে যেরূপ জড় বলা যায়, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর ব্যতিরেকে শক্তিকেও সেইরূপ জড়স্বরূপ বলা যাইতে পারে; কারণ, শক্তি ও শিব পরস্পর পৃথক্ হয়েন না, উভয়ের অবিনাভাব সম্বন্ধ মূলপ্রকৃতি হইতে জগতের চরমসৃষ্টি পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের দিব্য শরীর বা স্বরূপোৎপত্তি সংক্ষেপে কথিত হইল। এক্ষণে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের বিরাট্ মূর্ত্তির উৎপত্তি কথিত হইতেছে। পূর্ব্বে যে গুণভেদে ত্রিবিধ বিন্দুর উল্লেখ হইয়াছে, তন্মধ্যে সাত্বিক বিন্দুর নাম বিন্দু, রাজসিক বিন্দুর নাম নাদ এবং তামসিক বিন্দুর নাম বীজ। বীজ হইতে প্রথমত শব্দতন্মাত্রের সৃষ্টি হয়। শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ, আকাশ হইতে স্পর্শতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ু, বায়ু হইতে রূপতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র হইতে তেজ, তেজ হইতে রসতন্মাত্র, রসতন্মাত্র হইতে জল, জল হইতে গন্ধতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। আকাশের

গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ, তেজের গুণ শব্দ স্পর্শ ও রূপ, জলের গুণশব্দ স্পর্শ রূপ ও রস, পৃথিবীর গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ।

এই যে আকাশ বায়ু তেজ জল ও পৃথিবীর উল্লেখ করিলাম, ইহারা প্রত্যেকেই পরস্পর বিশ্লিষ্ট ও অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ভূতমাত্র। পরে পঞ্চীকরণ হইলে ইহাদের সূক্ষ্মাংশ পরস্পর মিলিত হইয়া স্থূলভূত রূপে পরিণত হইবে। আপাতত বিন্দু, তন্মাত্র, অপঞ্চীকৃত ভূত ও পঞ্চীকৃত ভূতের পরস্পর বিভেদক একটী সামান্য লক্ষণ বলিতেছি। যাহার দীর্ঘতা নাই, প্রস্থ নাই ও বেধ নাই, তাদৃশ অবস্থাপন্ন পদার্থকে বিন্দু বলে। যাহার দীর্ঘতা আছে, প্রস্থ নাই ও বেধ নাই, তাদৃশ অবস্থাপন্ন পদার্থকে তন্মাত্র বলা যায়। যাহার দীর্ঘতা আছে, প্রস্থ আছে, অথচ বেধ নাই, তাদৃশ অবস্থাপন্ন পদার্থকে অপঞ্চীকৃত ভূত বলা যায়। যাহার দীর্ঘতা আছে, প্রস্থ আছে ও বেধ আছে, তাদৃশ অবস্থাপন্ন পদার্থকে পঞ্চীকৃত ভূত বলা যায়। ইহা পরে বিশেষরূপে ব্যক্ত করা যাইবে।

বীজ হইতে যেরূপ আকাশের সৃষ্টি হইল, সেই সময় সেইরূপ নাদ হইতে শব্দশক্তির এবং বিন্দু হইতে শ্রবণেন্দ্রিয় ও শব্দজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ বীজ হইতে বায়ু সৃষ্টির সমকালে নাদ হইতে স্পর্শশক্তি ও বিন্দু হইতে ত্বগিন্দ্রিয় ও স্পর্শজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে; এবং বীজ হইতে তেজের সৃষ্টি সময়ে নাদ হইতে তৈজস শক্তির সৃষ্টি ও বিন্দু হইতে দর্শনেন্দ্রিয় ও রূপজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ বীজ অর্থাৎ তামসিক বিন্দু হইতে জলের সৃষ্টি সময়ে নাদ অর্থাৎ রাজসিক বিন্দু হইতে রসশক্তি এবং সাত্ত্বিক বিন্দু হইতে রসনেন্দ্রিয় ও রসজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ বীজ হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি সময়ে নাদ হইতে গন্ধশক্তির সৃষ্টি এবং বিন্দু হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও গন্ধজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, নাদ অর্থাৎ রাজসিক বিন্দু, হইতে শব্দশক্তি, স্পর্শশক্তি, তৈজসশক্তি রসশক্তি ও গন্ধশক্তির, সৃষ্টিকালে পঞ্চভূতের অংশ হইতে পৃথক্ পৃথক্ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

এক্ষণে সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখুন, বীজ শব্দে অভিহিত তামসিক বিন্দু, শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র এবং অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, এই সূক্ষ্ম পঞ্চভূত এবং পঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ও স্থূল আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী, এতৎসমুদায় বিরাট্ মূর্ত্তি মহেশ্বরের শরীর। নাদ শব্দে অভিহিত রাজসিক বিন্দু, অপঞ্চীকৃত ও পঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ও স্থূল শব্দশক্তি, স্পর্শশক্তি, রূপশক্তি, রসশক্তি, ও গন্ধশক্তি এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এতৎসমুদায় বিরাট্ মূর্ত্তি ব্রহ্মার শরীর। এইরূপ বিন্দু নামে অভিহিত সাত্ত্বিকবিন্দু, অপঞ্চীকৃত ও পঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ও স্থূল শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, রসজ্ঞান, গন্ধজ্ঞান, শ্রবণেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ও চিত্ত, এই চতুর্ব্যূহাত্মক অন্তঃকরণ, এতৎসমুদায় বিরাট্ মূর্ত্তি বিষ্ণুর শরীর। এই ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রের সমষ্টিকে অপরপ্রণব ও শব্দব্রহ্ম বলা যায়।

ক্রমশঃ—

মহাকাব্যের পরিচয়।

মহাভারত ও রামায়ণ আদর্শ ইতিহাসের গুণে কিরূপ ভূষিত, তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। এই দুই মহাগ্রন্থে আমরা প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য সমাজের পূর্ণ বিবরণ প্রাপ্ত হই। কিন্তু সেই বিবরণ তাহাদের বাহ্যাবয়ব মাত্র। প্রাচীন আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, প্রভৃতি তাহাতে বর্ণিত আছে বটে, কিন্তু তাহা কাব্য-লিখিত চরিত্র ও ঘটনা বর্ণনছলেই বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনার প্রগাঢ়তায় ও বর্ণগৌরবে কাব্যসৃষ্টি আবরিত হইয়া পড়িয়াছে। তজ্জন্য মহাভারত ও রামায়ণ সচরাচর ইতিহাস রূপেই গৃহীত হইয়া থাকে। ইতিহাস রূপে গৃহীত হইবার দ্বিবিধ কারণ দেখিতে পাওয়া যায়।

১। যাঁহারা কাব্য ও ইতিহাসের প্রভেদ বুঝেন না, তাঁহাদের নিকট ঐ গ্রন্থদ্বয় ইতিহাস বা পুরাবৃত্ত ভিন্ন অন্যরূপে প্রতীয়মান হইতে পারে না। এই প্রকার লোক সংখ্যাই অধিক, সুতরাং অধিকতর লোকের কাছে মহাভারত ও রামায়ণ ইতিহাস।

২। যাঁহারা কাব্য ও ইতিহাসের প্রভেদ বুঝেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে ঐ গ্রন্থদ্বয় পাঠ বা শ্রবণ করিয়া উহাদের বাহ্যাবয়ব রূপ ঐতিহাসিক বিবরণে এত অভিভূত হন, যে উহাদের কাব্যসৃষ্টি দেখা বা বিচার করা তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত কাঠিন হইয়া পড়ে। বর্ণিত পাত্র ও পাত্রীগণ জীবিত-চিত্র-প্রায় এতদূর তাঁহাদের চিত্ত অধিকার করে যে, তাঁহারা উহাদিগকে ঐতিহাসিক জীবিত পাত্র ও পাত্রী ভিন্ন অন্যরূপে সহজে বিশ্বাস করিতে পারেন না। ঐতিহাসিক মোহে চিত্ত এত মুগ্ধ হয় যে, প্রকৃত তত্ত্ব বিচার করিয়া মোহলব্ধ বিশ্বাস অপসারণ করা তত প্রীতিকর বোধ হয় না।

কিন্তু সাধারণ লোকে সচরাচর উহাদিগকে ইতিহাস বলিলেই কি বাস্তবিক ঐ গ্রন্থদ্বয় ইতিহাস হইয়া যাইবে। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, সাধারণ লোকে উহাদিগকে যে ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে সেই ভাব ভাবিয়া ব্রহ্মাও একদা সঙ্কুচিত হইয়া মহাভারতকে কাব্য বলিয়া ছিলেন। যাহা বাস্তবিক কাব্য রূপে কল্পিত হইয়াছে, তাহাকে তিনি কাব্য না বলিয়া আর কি বলিবেন? তিনি বলিয়া গেলেন, মহাভারত কাব্য বলিয়াই জগতে প্রচারিত হইবে। রামায়ণ সম্বন্ধে ও ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন—

"ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি।"

হে বাল্মীকি! তুমি নারদকথিত রাম চরিত্র কথা যেরূপে বিস্তৃত করিয়া শ্লোকময় কাব্যে বর্ণন করিবে, সেই কাব্যের কোন কথা মিথ্যা হইবে না।

ব্যাসের সহিত ব্রহ্মার কথোপকথন রূপ আখ্যায়িকা দিয়াই ব্যাস, মহাভারত ইতিহাস কি কাব্য, এই কথার মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। পাছে লোকে ভারতকে প্রাকৃত ঐতিহাসিক বিবরণ রূপে গ্রহণ করে, সেই জন্য তিনি মহাভারতের আদিতেই সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, আমি মহাভারতকে কাব্য রূপেই সৃষ্টি করিয়াছি, সুতরাং তাহা কাব্য রূপে গৃহীত ও অধীত হইলেই লোকে তাহার রস-গ্রহণে সমর্থ হইবেন। নিজে রচয়িতা ব্যাস যখন মহাভারতকে কাব্য বলিয়া গিয়াছেন, তখন তাহাকে অন্যভাবে গ্রহণ করিতে গেলে তাহার প্রকৃত কল্পনা কথনই অনুভূত হইতে পারে না। যাহা যেভাবে কল্পিত, তাহাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করা উচিত। অন্যভাবে গ্রহণ করিতে গেলে তাহার কল্পনা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে, এবং লোকে তাহার প্রকৃত রসাস্বাদনে বঞ্চিত হইবেন।

এক্ষণে কথা এই, মহাভারত ও রামায়ণের কাব্যসৃষ্টিই বা কোন্ অংশে এবং উহাদের ইতিহাসই বা কোন্ অংশে? কাব্যসৃষ্টি উহাদের অভ্যন্তরে, ইতিহাস উহাদের বাহ্যাবরণে। কাব্যসৃষ্টি উহাদের কল্পনায়, ইতিহাস সেই কল্পনার ভূষণ। কাব্য সৃষ্টি উহাদের মূলে ও স্কন্ধে, ইতিহাস উহাদের পল্লবে। কাব্য সৃষ্টি উহাদের মূল আখ্যায়িকা রচনায়, ইতিহাস সেই আখ্যায়িকা বর্ণনায়। এই কাব্য-সৃষ্টিমূলক প্রধান আখ্যায়িকাকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্য ব্যাস মহাভারতের আদিতেই তাহা দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। পাছে লোকে সেই আখ্যায়িকা ভাগ দেখিতে না পায়, পাছে তাঁহার কাব্যসৃষ্টি কোথায় আমরা দেখিতে না পাই, এজন্য ব্যাস তাহা স্বতন্ত্ররূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। মহাভারতের যে প্রধান আখ্যায়িকা ভাগে ব্যাস কাব্য সৃষ্টি সমাবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, সেই আখ্যায়িকা ভাগ কি, আমরা তাহা ব্যাসেরই নির্দ্দেশ মত দেখাইতেছি।

সেই আখ্যায়িকা গ্রন্থের প্রারম্ভেই এই মহামন্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়—

"দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা।
দুঃশাসনঃ পুষ্প ফলে সমৃদ্ধে
মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রো মণীষী।
যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা।
মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ।*

এই মূল মন্ত্র, মহাভারতের প্রধান আখ্যায়িকা সংগঠিত করিয়াছে। এই মন্ত্র আমরা শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে উচ্চারিত হইতে দেখিতে পাই। শ্রাদ্ধাদি কার্য্য বৈদিক

* মহাভারতের সূচনা যেমন এই কর ছত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, রামায়ণও তদ্রূপ নারদোক্ত আখ্যানে সূচিত হইয়াছে। গ্রীক মহাকাব্যের সূচনারও এই রূপ নিয়ম।

কাল হইতে প্রচলিত আছে। সুতরাং প্রাচীন বৈদিক কাল হইতেই মহাভারতীয় মূল ভিত্তি স্থাপিত আছে। ব্যাস সেই ভিত্তির উপর যে মহাট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহারই নাম ভারত-সংহিতা। সেই ভিত্তি মূলক অট্টালিকা নানা ভূষণে ভূষিত হইয়াছে। যেমন রাজপ্রাসাদ নানা পারিপার্শ্বিক ভূষণে সজ্জিত থাকে, তাহার নানা পার্শ্ব কুঞ্জবন, পুষ্পোদ্যান, উপবন, সরোবর, অশ্বালয়, গজালয়, আয়ুধাগার, সৈন্যসমাবেশ, নর্ত্তকালয়, প্রান্তর, রঙ্গভূমি, প্রভৃতি নানা সজ্জায় সজ্জিত থাকে, মহাভারতীয় প্রধান অট্টালিকা ভাগ ও তদ্রূপ নানা উপন্যাস ও আখ্যানভূষণে সজ্জিত হইয়াছে। ব্যাস সেই অট্টালিকা ভাগকে স্বতন্ত্র দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। এই অট্টালিকা প্রথমে নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে মূল আখ্যায়িকা ব্যাস সর্ব্ব প্রথমে রচনা করেন, তাহা ভারতসংহিতা নামে স্বতন্ত্র সংজ্ঞায় আখ্যাত হইয়াছে। এই ভারতসংহিতারই ব্যাস বিস্তৃত বৈশম্পায়নোক্ত মহাভারত। বৈশম্পায়ন নিজেই তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

চতুর্বিংশতি সাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্।
উপাখ্যানৈর্বিনা তাবৎ ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥
ততোঽধ্যর্দ্ধ শতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবানৃষিঃ।
অনুক্রমণিকাধ্যায়ং বৃত্তান্তানাং সপর্ব্বণাম॥
ইদং দ্বৈপায়নঃ পূর্ব্বং পুত্রমধ্যাপয়ৎ শুকম্।
ততোঽন্যেভ্যোঽনুরূপেভ্যঃ শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌবিভুঃ।
ষষ্টিংশত সহস্রাণি চকারান্যাং স সংহিতাম্।
ত্রিংশচ্ছত সহস্রংচ দেবলোকে প্রতিষ্ঠিতম্॥
পিত্র্যে পঞ্চদশ প্রোক্তং গন্ধর্ব্বেষু চতুর্দশ।
একং শতসহস্রং তু মানুষেষু প্রতিষ্টিতম্॥
নারদোঽশ্রাবয়ৎ দেবান্ অসিতো দেবলঃ পিতৄন্।
গন্ধর্ব্বযক্ষরক্ষাংসি শ্রাবয়ামাস বৈ শুকঃ॥
অস্মিংস্ত মানুষে লোকে বৈশম্পায়ন উক্তবান্।
শিষ্যো ব্যাসস্য ধর্ম্মাত্মা সর্ব্ববেদবিদাংবরঃ॥
বৈশম্পায়নবিপ্রর্ষিঃ শ্রাবয়ামাস পার্থিবম্।
পারিক্ষিতং মহাত্মানং নাম্না তং জনমেজয়ম্॥
সংহিতাস্তৈঃ পৃথক্ত্বেন ভারতস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ।
একং শতসহস্রং তু ময়োক্তং বৈ নিবোধত॥
মহাভারত আদিপর্ব্ব।

"মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রথমতঃ উপাখ্যান ব্যতিরেকে চতুর্বিংশতিসহস্র শ্লোকে* ভারত সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ ইহাকেই মূল মহাভারত বলিয়া থাকেন। অনন্তর তিনি সংক্ষেপে একশত পঞ্চাশৎ শ্লোক দ্বারা পর্ব্ব ও বৃত্তান্ত সমুদায়ের অনুক্রমণিকাধ্যায় প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ভগবান দ্বৈপায়ন এই মহাভারত প্রণয়ন করিয়া প্রথমতঃ পুত্র শুককে পড়াইলেন। অনন্তর তিনি অন্যান্য উপযুক্ত শিষ্যগণকেও এবিষয়ে শিক্ষা দিলেন"।

এই মূল মহাভারতের সমগ্র ভাগ কেবল ব্যাসের পুত্র শুকদেব এবং কতিপয় উপযুক্ত শিষ্যভিন্ন আর কেহ অধিকারী হন নাই। কারণ, আমরা দেখিতে পাই সেই মূল সংহিতা যখন অধিকারী ভেদে জ্ঞানধর্ম্মসমুন্নত

* উত্তর কাণ্ড ব্যতিরেকে বাল্মীকিও প্রথমে রাবণবধ পর্য্যন্ত যে রামায়ণ প্রণয়ন করেন তাহার ও শ্লোক সংখ্যা চতুর্ব্বিংশতি সহস্র।

দেবলোক, পিতৃলোক ও গন্ধর্ব্বলোকে অংশে অংশে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, তখন তাহা উপাখ্যান সহিত বৰ্দ্ধিত ও সমলঙ্কৃত হইয়াছিল। নহিলে সকলে তাহার রসজ্ঞ হইতে পারিত না। বৈশম্পায়ন বলিতেছেন :—

"দ্বৈপায়ন ষষ্টি লক্ষ শ্লোক দ্বারা উপাখ্যান সহিত আর এক খানি বিস্তীর্ণ মহাভারত সংহিতা প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে ত্রিশ লক্ষ শ্লোক দেবলোকে, পঞ্চদশ লক্ষ পিতৃলোকে, চতুর্দ্দশ লক্ষ গন্ধর্ব্বলোকে এবং এই মনুষ্য লোকে এক লক্ষ শ্লোক প্রচারিত হইয়াছে। নারদ দেবগণকে, অসিতদেবল পিতৃগণকে, শুক গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও রাক্ষসগণকে শ্রবণ করাইয়াছেন। ব্যাসের শিষ্য বেদবেত্তা ধর্ম্মাত্মা বৈশম্পায়ন এই মনুষ্যলোকে মহাভারত কীর্ত্তন করেন। সেই বিপ্রর্ষি প্রথমতঃ পরীক্ষিত-তনয় মহাত্মা মহারাজ জনমেজয়কে শ্রবণ করাইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত মহর্ষিরা শ্রোতৃভেদে মহাভারতের পৃথক্ পৃথক্ সংহিতা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু মনুষ্যলোকে এক লক্ষ শ্লোক বৈশম্পায়ন কীর্ত্তন করিয়াছেন"।

মূল সংহিতাকে উপাখ্যান দ্বারা বিস্তৃত করিয়া যে মহাভারত মনুষ্যলোকের উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছিল, আমরা সেই মহাভারত প্রাপ্ত হইয়াছি। এই মূল মহাভারত মধ্যেই মূল চতুর্বিংশ সহস্র সমন্বিত সংহিতা বিদ্যমান আছে। সেই মূল সংহিতায় মহাভারতের প্রধান আখ্যায়িকা স্থাপিত হইয়াছে। ব্যাস সেই সংহিতাকে কাব্য বলিয়া ব্রহ্মার নিকট পরিচয় দিয়াছিলেন। সুতরাং মূল মহাভারতীয় আখ্যায়িকা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের কবি-কল্পনা সম্ভূত সামগ্রী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এই মূল সংহিতাংশকে বিশ্লেষণ করিবার পন্থা মহাভারত মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই অংশ আমরা কি রূপে বাহির করিয়া লইব? সেই সংহিতার বিশেষ আলোচ্য বিষয় ও লক্ষণ মহাভারত মধ্যে এই রূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

দ্বৈপায়নেন যৎ প্রোক্তং পুরাণং পরমর্ষিণা।
সুরৈর্ব্রহ্মর্ষিভিশ্চৈব শ্রুত্বা যদভিপূজিতম্॥
তস্যাখ্যান বরিষ্ঠস্য বিচিত্র পদপর্ব্বণঃ।
সূক্ষ্মার্থন্যায়যুক্তস্য বেদার্থৈর্ভূষিতস্য চ॥
ভারতস্যেতিহাসস্য পুণ্যাং গ্রন্থার্থসংযুতাম্।
সংস্কারোপগতাং ব্রাহ্মীং নানাশাস্ত্রোপ-
বৃংহিতাম্॥
জনমেজয়স্য যাং রাজ্ঞো বৈশম্পায়ন
উক্তবান্।
যথাবৎ স ঋষিস্তুষ্টঃ সত্রে দ্বৈপায়নাজ্ঞয়া॥
বেদৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তাং ব্যাসস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
সংহিতাং শ্রোতুমিচ্ছামঃ পুণ্যাং পাপ
ভয়াপহাম্॥

"ঋষিগণ কহিলেন, মহর্ষি দ্বৈপায়ন যে পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছেন, সুরগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ শ্রবণ করিয়া যাহার পূজা করিয়া থাকেন, যাহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরম রমণীয় উপাখ্যান আছে, যাহা বিচিত্র (স্বর্থবাচক) পদ ও আদি সভাদি বিচিত্র পর্ব্বযুক্ত, যাহা আত্মতত্ত্বের সূক্ষ্মতা, আত্মতত্ত্ব প্রতীতির অনুকূল যুক্তিমূলীয় ন্যায়, ও বেদার্থে সমলঙ্কৃত, যাহা পরম পবিত্র, গ্রান্থর্থসংযুক্ত ও পদাদিব্যুৎপত্তিমতী ভাষায় গ্রথিত, যাহার সহিত শাস্ত্রান্তরের বিরোধ নাই, যে প্রসিদ্ধ

ভারত ইতিহাস বৈশম্পায়ন ভগবান্ দ্বৈপায়নের সমক্ষে তদীয় আজ্ঞানুসারে সন্তুষ্টহৃদয়ে রাজা জনমেজয়ের নিকট যজ্ঞস্থলে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, যাহাতে চতুর্ব্বেদের অর্থ গ্রথিত আছে, যাহা শ্রবণ করিলে চিত্ত শুদ্ধি ও শ্রেয়োবৃদ্ধি হয়, অদ্ভুতকীর্ত্তি ব্যাসকৃত সেই ভারতসংহিতা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।"

ভারতসংহিতার পরিচয় এই স্থলেই শেষ হয় নাই। এই সংহিতা-নিবিষ্ট আখ্যায়িকার প্রতিপাদ্য বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

বিস্তরং কুরুবংশস্য গান্ধার্য্যা ধর্ম্মশীলতাম্।
ক্ষত্তুঃ প্রজ্ঞাং ধৃতিং কুন্ত্যাঃ সম্যক্
দ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ।
বাসুদেবস্য মাহাত্ম্যং পাণ্ডবানাঞ্চ সত্যতাম্।
দুর্বৃত্তং ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাম্ উক্তবান্ ভগবানৃষিঃ।

"কর্ম্মফলভোগপ্রতীয়মানস্বরূপ কুরুবংশের বিস্তার গান্ধারীর ধর্ম্মশীলতা, বিদুরের প্রজ্ঞা, কুন্তীর ধৃতি, ভগবান বাসুদেবের মাহাত্ম্য, পাণ্ডবগণের সত্যনিষ্ঠা, ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের দুর্বৃত্ততা, ভগবান মহর্ষি দ্বৈপায়ন এই সমুদায় মহাভারত মধ্যে কীর্ত্তন করিয়াছেন।"

এই প্রধান কাব্যকল্পনা ভারত-সংহিতায় প্রথমে স্থাপিত হইয়াছিল। পরে এই সংহিতাংশ নানাবিধ ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার সহিত বিস্তৃত হইয়া শত সহস্র শ্লোকে পূর্ণ হইয়াছে। এই কাব্য এরূপে রচিত ও বিন্যস্ত যে, ব্যাস তন্মধ্যে পুরাকালের কোন জ্ঞাতব্য বিবরণ সন্নিবেশ করিতে ক্রটি করেন নাই। তিনি সেই সমস্ত বিবরণ সন্নিবিষ্ট করিবার জন্য স্থানে স্থানে অবসর করিয়া লইয়াছেন এবং পাত্র ও পাত্রীগণকে এরূপে সজ্জিত করিয়াছেন যে, তাহাদের কার্য্য ও সম্ভাষণ দ্বারা সমুদায় ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন। কেবল সাজাইবার গুণে কাব্য এই রূপে ঐতিহাসিক গুণে ভূষিত হইয়াছে। সেই ঐতিহাসিক আবরণে কাব্য ভাগ আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে। বর্ণনাচাতুর্য্যে পাত্র ও পাত্রীগণ জীবন্তবর্ণে পরিদৃশ্যমান হইয়াছে।

যে যে কথা ও প্রসঙ্গ মহাভারতকাব্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা ব্যাস ব্রহ্মার সমক্ষেই পরিচয় দিয়াছেন। এই বিষয় সমুদায় অসংখ্য। "সমুদায় বেদের ও অন্যান্য নানা শাস্ত্রের রহস্য; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিস্, নিরুক্ত ও ছন্দ এই ছয় অঙ্গের সহিত বেদ ও উপনিষদের বিস্তার, ইতিহাস ও পুরাণের উন্মেষ ও সংগ্রহ; ত্রিবিধ কাল নিরূপণ, জরা, মৃত্যু, ভয়, ব্যাধি, ভাব, অভাব প্রভৃতির নির্ণয়; বিবিধ ধর্ম্মের লক্ষণ, বিবিধ আশ্রমের লক্ষণ, চাতুর্বর্ণ্যবিধান, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা প্রভৃতির স্থিতি ও পরিমাণ, যুগ-নিরূপণ, চতুর্ব্বেদ, অধ্যাত্মতত্ত্ব, ন্যায়শাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, দানধর্ম্ম, পাশুপত ধর্ম্ম, দেবজন্ম ও মনুষ্য জন্মের বিবরণ, নদী, বন, পর্ব্বত, সমুদ্র প্রভৃতির নির্ণয়; প্রাচীন যুদ্ধ কৌশল, ধনুর্ব্বেদ, ব্যূহ-রচনা, দুর্গ ও সেনারচনার বিধি, রাজা, অমাত্য, চেট প্রভৃতি বক্তাভেদে বাক্যভেদ, লোকযাত্রাক্রম, নীতিশাস্ত্র"—প্রভৃতি যাহা যাহা সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতব্য ও প্রয়োজনীয়

বিষয় তৎসমুদায়ই মহাভারত মধ্যে বিবৃত হইয়াছে। নিখিল সংসার মহাভারত মধ্যে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃত ঘটনা বর্ণনায় কখন সমস্ত সংসার আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে না। প্রকৃত ও সামান্য ঘটনা ব্যাসের লেখনীর যোগ্যও নহে। তাঁহার লেখনীর যোগ্য সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড। সেই ব্রহ্মাণ্ডকে ও ব্রহ্মাণ্ডপতি নারায়ণকে সম্যকরূপে বিকাশ করিয়া দেখাইবার জন্য মহাভারতীয় বিরাট কাব্যের মহা কল্পনার সৃষ্টি। সেই বিরাট মূর্ত্তি দেখাইবার জন্য নিখিল সংসারের আয়োজন। আয়োজন, সব এক গ্রন্থ মধ্যেই। মহাভারতের বিশাল দেহে সেই দেদীপ্যমান বিরাটমূর্ত্তি বিরাজিত আছে। যিনি সে মূর্ত্তি দেখিতে না পান, তিনি মহাভারতের কিছুই দেখেন নাই।

যে মূর্ত্তি বিরচন করিবার জন্য মহাভারতীয় কাব্যসৃষ্টির কল্পনা, মহাভারত সেই মূর্ত্তিতে ওতপ্রোত হইয়া আছে। প্রথমে তাহার ঈষদাভাস, পরে ক্রমশঃ সেই মূর্ত্তি অল্পে অল্পে আবির্ভূত হইয়া অবশেষে এত বিস্তারিত ও বিরাট বেশে প্রতীয়মান হইলেন যে, সমুদায় মানসপুর একেবারে অধিকার করিয়া বসিলেন। চিত্ত তন্ময় হইয়া গেল, সমুদায় গ্রন্থ সেই মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ হইল।

দ্বৈপায়ন কৃষ্ণ এই বিশ্বরূপী ভগবান্ নারায়ণকে প্রতীয়মান করাইবার জন্য যে কাব্য-কল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তিনি মহাভারত-কথা আরব্ধ করিবার প্রারম্ভেই সংকল্প করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভারতীয় কাব্য-সৃষ্টিতে কিরূপে শুদ্ধ সত্ত্বময় জ্ঞান-বিগ্রহ-স্বরূপ পরমাত্মা প্রতীয়মান হইবেন তাহা কথিত হইতেছে—

"বক্ষ্যমান মহাভারতের দুর্য্যোধন ক্রোধময় মহাবৃক্ষ, কর্ণ তাহার স্কন্ধ, শকুনি তাহার শাখাস্বরূপ, দুঃশাসন সমৃদ্ধ ফলপুষ্প স্বরূপ এবং অমনীষী মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এই ক্রোধময় মহাবৃক্ষের মূলস্বরূপ"।

এই গেল পাপ-পক্ষ। টীকাকার নীলকণ্ঠ স্বামী এই পাপ-পক্ষ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, দ্বেষ, ঈর্ষা, অসূয়াদি সমস্ত পাপ প্রবৃত্তি দুর্য্যোধনের ভ্রাতৃগণ রূপে মহাভারতে কল্পিত হইয়াছে। বাস্তবিক আমরাও সংসার ক্ষেত্রে দেখিতে পাই যে, এই পাপ প্রবৃত্তি সমুদায় শত আকারে যখন প্রধূমিত হইয়া উঠে তখনই তাহা ক্রোধরূপে পরিণত হইয়া কার্য্যোন্মুখী হয়, এবং যখন তাহা কার্য্যোন্মুখী হয়, তখনই তাহা ক্রোধময় দুর্য্যোধন। সে ক্রোধের শান্তি তুমুল সংগ্রাম ব্যতীত কিছুতেই সংঘটিত হয় না। পৃথিবীর কার্য্যক্ষেত্রে এই রূপই লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে যে সংগ্রাম অনিবার্য্যরূপে উদয় হয়, সেই সংগ্রামই কুরুক্ষেত্রের * যুদ্ধ। লোকে লোকে, জাতিতে জাতিতে, ব্যক্তিতে, ব্যক্তিতে রাজায় রাজায়, রাজায় প্রজায়, প্রজায় প্রজায়, এই যুদ্ধ

* এই জন্য মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের বিশেষণ ধর্ম্মক্ষেত্র বলা হইয়াছে। যেমন উর্ব্বরা ক্ষেত্রে বীজ বপিত হইলে ক্রমে অঙ্কুরিত পল্লবিত ও বর্দ্ধিত হইয়া ফলপুষ্পশালী বৃক্ষ রূপে পরিণত হয় সেই রূপ কর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মবীজ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন কুরুবৈ দেব যজনম্।

নিয়ত ঘটিতেছে। যেখানে পাপপক্ষ প্রবল হইয়া ক্রোধরূপে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সেখানে যুদ্ধ ব্যাপার অনিবার্য্য। কিছুতেই তাহার শান্তি নাই। বিনা কুলক্ষয়ে, বিনা রক্তপাতে, বিনা পাপের প্রশমনে ও ধ্বংশে তাহার শান্তি হইবার কোন উপায় নাই। নিজে ব্রহ্মা ও সেযুদ্ধ নিবারণ করিতে পারেন না। এই প্রত্যক্ষ ব্যাপার মহাভারতীয় কল্পনা। মহাভারতীয় কল্পনায় পাপপক্ষ এই রূপ সাজাইয়া বেদব্যাস ধর্ম্মপক্ষ কি রূপ সাজাইয়াছেন দেখুন—

"যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ স্বরূপ, অর্জ্জুন তাহার স্কন্ধ স্বরূপ, ভীমসেন শাখা স্বরূপ, নকুল ও সহদেব সুসমৃদ্ধ পুষ্প ও ফল স্বরূপ; কৃষ্ণ (পরমাত্মা) ব্রহ্ম (বেদ) ও ব্রাহ্মণগণ (বেদ উপদেষ্টা) এই ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষের মূল স্বরূপ।"

যিনি ধর্ম্মযুদ্ধে স্থির থাকিয়া জয়লাভ করেন তিনিই যুধিষ্ঠির। পরম ধৈর্য্যশীল প্রশান্ত ধর্ম্ম বিগ্রহের কল্পনাই যুধিষ্ঠির। প্রশান্ত ভাবে ধর্ম্ম যুদ্ধে স্থির থাকিয়া জয়লাভ করিতে গেলে সম, দম, সত্য, অহিংসাদির নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠে। এই সমস্ত ধর্ম্মপ্রবৃত্তিই যুধিষ্ঠিরের সহায় স্বরূপ ভ্রাতৃগণরূপে কল্পিত হইয়াছে। নীলকণ্ঠ স্বামী এই ধর্ম্মপক্ষের মর্ম্মব্যাখ্যা করিতে গিয়া সেই কথাই বলিয়াছেন। মানব-হৃদয়ে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মপক্ষ উভয়ই বর্ত্তমান। সংসারের কার্য্য ক্ষেত্রে তাহারা দেখা দেয়। এই প্রলোভনপূর্ণ সংসারে এক দিকে পাপের পক্ষ প্রবল হইয়া উঠিতেছে, অন্য দিকে মানবের সদ্বৃত্তি সমুদায় স্বভাবতঃ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছে। যখন এই বিপরীত পক্ষদ্বয়ের মহাদ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তখনই মানব-হৃদয়ে ধর্ম্মযুদ্ধের উপচয় হইয়া থাকে। এই ধর্ম্মযুদ্ধের নাম কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। এই যুদ্ধের এক পক্ষের নায়ক ক্রোধময় দুর্য্যোধন, অন্য পক্ষে সাত্বিক জ্ঞান ও বুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণরূপে সমুদায় সংগ্রামের নায়কত্ব গ্রহণ করেন। এই জন্য বেদব্যাস ধর্ম্ম রূপী যুধিষ্ঠির রূপ মহাবৃক্ষের মূলে কি স্থাপন করিলেন? না—শুদ্ধ সত্ত্বময় জ্ঞান-বিগ্রহ-পরমাত্মা রূপ শ্রীকৃষ্ণ, বেদ ও বেদাঙ্গ রূপ ব্রহ্ম; এবং সেই বেদ উপদেষ্টা ব্রাহ্মণগণ। আমরা মহাভারত মধ্যে কোন ব্যাপারে কৃষ্ণ বেদ ও ব্রাহ্মণগণ ব্যতীত যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে পাই না। যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া এবং বেদ ও শ্রীকৃষ্ণকে সমক্ষে রাখিয়া সকল কার্য্য সমাধা করিতেন। যে ধর্ম্মবিক্রমরূপী অর্জ্জুন সাত্বিক জ্ঞান রূপী কৃষ্ণের সারথ্য দ্বারা পরিচালিত না হয়, সে বিক্রম ধর্ম্মযুদ্ধে কখন বিজয়ী হইতে পারে না। ভগবান কর্ত্তৃক চালিত না হইলে ধর্ম্মবিক্রম কখনই ধর্ম্মকে সংস্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। মানব-হৃদয়ে ধর্ম্মযুদ্ধে যাহা সংঘটন হয় মহাভারতীয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অবিকল তাহাই ঘটিয়াছে। ব্যাস মানব-হৃদয়কে এই রূপ বিকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন। দেখাইয়াছেন যিনি এই যুদ্ধে জয়ী হইতে চাহেন, তিনি যেন সাত্বিক বুদ্ধি দ্বারা বরাবর নীয়মান হন। সাত্বিক জ্ঞানকে নায়কত্ব না দিলে সংসার ক্ষেত্রে নিস্তার নাই। পাপপক্ষে অহর্নিশ ষড়যন্ত্র করিয়া মানবকে মহাকলুষ পঙ্কে ডুবাইতে চাহে। সে ষড়যন্ত্র ভেদ করিতে হইলে তীক্ষ্ণ সাত্বিকজ্ঞান

আবশ্যক। শুদ্ধ সাত্ত্বিকজ্ঞান নহে, তাহা ধর্ম্মবিক্রমে বলীয়ান হওয়া চাই। নর নারায়ণ একত্রে সংমিলিত হওয়া চাই। পুরুষত্ব ও জ্ঞান একত্রে কার্য্য করা চাই। তবে সংসার-ক্ষেত্রে জয়লাভের সম্ভাবনা। এই ব্যাপার লইয়া মহাভারতের সৃষ্টি। ব্যাস মহাভারতীয় ধর্ম্মপক্ষের কল্পনা এই রূপে সঙ্কেত করিয়া ভগবান নারায়ণকে উজ্জ্বলবর্ণে সর্ব্বস্থলে পরিদৃশ্যমান করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি প্রথমে যে কৃষ্ণকে দেখাইয়াছেন, উত্তরোত্তর সেই কৃষ্ণের মূর্ত্তি বিরাটাকার ধারণ করিয়াছে। জগৎ সংসার যেমন নারায়ণের রূপ, মহাভারতও তেমনি নারায়ণের রূপ। এই জন্য ব্যাস গোড়াতেই বলিয়াছেন মহাভারতীয় মহা বৃক্ষের

মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণশ্চ।

মহাভারতের প্রারম্ভেই তাহার কিরূপ কাব্য পরিচয় আছে তাহা আমরা প্রদর্শন করিলাম। ব্যাসের নিজ মুখের পরিচয় যাহা, তাহাই দিয়াছি। একথায় কাহার আপত্তি হইতে পারে না। এই কাব্য-নিবিষ্ট আখ্যায়িকার পাত্র ও পাত্রীগণ যে প্রকৃত ঐতিহাসিক লোক নহেন, তাহারা যে কেবল কাব্য-রচিত চরিত্র মাত্র, তাহাই যেন বিশেষ রূপে পরিচয় দিবার জন্য, ব্যাস সেই পাত্র ও পাত্রীগণকে দেবসম্ভব করিয়া অদ্ভুত রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। কি পাণ্ডবগণ, কি কৌরবগণ, কি দ্রৌপদী কাহারই জন্ম প্রাকৃত জন্ম নহে। তাঁহাদের উৎপত্তি ও জন্ম অদ্ভুত। তাঁহারা কেহই সাধারণ মনুষ্যের মত জন্ম গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের অলৌকিক জন্ম দিয়া ব্যাস তাঁহাদিগকে কাব্যের কল্পিত চরিত্র রূপে দেখাইয়াছেন। রামায়ণে যে রূপ দাশরথিগণের জন্ম অদ্ভুত, মহাভারতীয় কুরু পাণ্ডবগণের জন্মও তদ্রূপ অদ্ভুত। উহারা সকলেই কাব্যের চরিত্র ও কাল্পনিক সৃষ্টি। ঐতিহাসি জনগণের সহিত উহাদের পার্থক্য এই রূপে প্রথমেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পাছে এসম্বন্ধে পাঠকের ভুলহয় এজন্য আদিতেই তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়া গিয়াছেন। মহাভারতীয় অনুক্রমণিকা ও আদিপর্ব্বের মাহাত্ম্য এই জন্য এত অধিক। সে যাহা হউক, যিনি এই রূপ কাব্যনিদর্শন তুচ্ছ করিয়া মহাভারতীয় প্রধান পাত্র ও পাত্রীগণকে প্রকৃত শরীরী ও ঐতিহাসিক চরিত্র রূপে গ্রহণ করিবেন, তিনি দেখিতে পাইবেন, সেই চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীন সঙ্গতি সাধন করা অতিশয় দুঃসাধ্য ব্যাপার। কেবল কাব্য-সৃষ্টি রূপেই তাহাদিগের সঙ্গতি রক্ষা হয়, এবং আদর্শ চিত্র রূপেই তাহারা কাব্যে সম্ভাবিত হয়। নহিলে প্রকৃত মানব শরীরে একাধারে এত গুণের একত্র সমাবেশ সম্ভবনীয় নহে। পাত্র সম্বন্ধে যাহা সত্য মহাভারতীয় ঘটনা সম্বন্ধে ও তাহাই সত্য। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। কৃষ্ণ যে বলিয়া ছিলেন :—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদা আত্মং সৃজাম্যহং।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

একথা কি ঐতিহাসিক ঘটনা রূপে প্রমাণীকৃত হয়? পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং—একথা কি অক্ষরে অক্ষরে

মহাভারত মধ্যে প্রমাণীকৃত হইয়াছে? যখন তুমি একথা ঐতিহাসিক ঘটনা রূপে প্রমাণ করিতে গেলে, তখন দেখিতে পাইলে মহাভারতীয় ঘটনায় তাহার কিছুই প্রমাণীকৃত হয় নাই। তন্ন তন্ন বিচার করিতে গেলে কে না পাপী বলিয়া গণ্য হয়? এমত কি যুধিষ্ঠিরকেও পাপ স্পর্শ করিয়াছিল। তিনিও বিরাটগৃহে এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার অসত্য ব্যবহার জন্য নরক দর্শন হইয়াছিল। তবে কেন যুধিষ্ঠিরও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন না? তদ্রূপ সকল পাপী কি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে? না সকল পুণ্যবানই মুক্তিরূপ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন? বাস্তবিক, বিচার্য্য কৃষ্ণোক্তি মহাভারতে ঐতিহাসিক পরীক্ষার তিষ্টিতে পারে না। কেবল কাব্য-কল্পনায় সে কথার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম হয়। মহাভারত একরূপ কল্পিত ও সজ্জিত, যে তাহাতে ধর্ম্মেরই উদ্ধার সাধন হইয়াছে এবং অধর্ম্মের ধ্বংস হইয়াছে। প্রমাণে একথা খাটিবে না, কারণ, কাব্য কোন কথা প্রমাণ করিতে চাহে না। কাব্য ন্যায়শাস্ত্র নহে, কাব্য বাস্তবিক ঘটনা ও ইতিহাস নহে। কাব্যে প্রমাণ নাই, কিন্তু ভাবের সঞ্চার আছে। কাব্যে এতদূর ভাবের প্রগাঢ়তা জন্মে যে হৃদয়ে সেই প্রগাঢ়তায় যে সত্য সংস্কারবৎ বদ্ধমূল হইয়া যায়, তাহা হৃদয় মধ্যে চিরকাল সঞ্চিত থাকে। মহাভারত পাঠে সেই ফলের উদয় হয়। মহাভারতে কোন সত্য প্রমাণ করে নাই, কিন্তু ঘটনা-যোজনা ও কল্পনার কৌশলে মনে এরূপ রসের সঞ্চার করিয়া দেয়, যদ্দ্বারা মন আর্দ্র হইয়া যায় এবং সেই আর্দ্র চিত্তে সত্যসকল বদ্ধমূল ও জাজ্বল্যমান হইয়া থাকে। বিচক্ষণ পাঠকের মনে বিলক্ষণ প্রতীতি হইতে থাকে কৃষ্ণ যথার্থই বলিয়াছিলেন ;—

"পরিত্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

ব্যাস এত বিশদ রূপে গ্রন্থারম্ভেই যে কাব্য-সৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, বাল্মীকিও গ্রন্থারম্ভে তাহার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। রামায়ণের আখ্যানভাগ দেবর্ষি নারদ গ্রন্থসূচনায় বলিয়া গেলেন। এই আখ্যানভাগ কবির কল্পনায় বিস্তৃত হইয়া কি আয়ত আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা আমরা রামায়ণে দেখিতে পাই। ব্যাসের সৃষ্টি-রাজ্যে এইরূপ বেদমন্ত্রের একটী সামান্য বীজাঙ্কুর বর্দ্ধিত হইয়া কেমন বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে, আমরা তাহারও পরিচয় দিয়াছি। বাস্তবিক কবির সৃষ্টিকল্পনায় সামান্য বিষয় কত বৃহৎ আকার ধারণ করিতে পারে, রামায়ণ ও মহাভারত তাহাই প্রমাণ করিতেছে। গ্রীক মহাকাব্যেও তাহা প্রতীত হয়। কিন্তু কবির অনুভব এত তন্ন তন্ন করিয়া সকল বিষয় রচিতে পারে, যেন অনুমান হয় সে সমুদায় বাস্তবিকই ঘটিয়া যাইতেছে। কবির সৃষ্টি কাল্পনিক জগতে যেন বাস্তবিকতার মোহন ছড়াইয়া দিয়া সে জগৎকে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান করিয়া দেখায়। বাল্মীকির কল্পনায় এইরূপ কাব্যসৃষ্টির শক্তি বিদ্যমান দেখিয়া ব্রহ্মা বলিয়া গেলেন—

"হে ঋষিবর, তুমি নারদের মুখে ধীমান রামের চরিত বিষয়ক যাহা শুনিয়াছ তাহা বর্ণন কর। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও রাক্ষসগণের বিষয় যাহা তোমার অবিদিত আছে, আমি বলিতেছি, সে সমুদায় তুমি জানিতে পারিবে। রাম, প্রিয়তমা সীতা ও জনক দশরথের সহিত কোন্ কোন্ সময়ে কি কি কথা কহিয়াছিলেন, এবং প্রজাগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা কিছুই তোমার অবিদিত থাকিবে না।"

বাল্মীকির কল্পনা সে সমুদায় দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিল। এই দিব্য চক্ষু যাহার নাই তিনি কবি নহেন। বাল্মীকি সেই দিব্যচক্ষে দেখিয়া যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা যেন সত্যসত্যই ঘটিয়াছে, এরূপ প্রতীতি হয়। বাল্মীকি যেন সকল বিষয় সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া লিখিয়া গেলেন। তাঁহার তেজস্বী কল্পনায় সমুদায় প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল। যাহা লিখিলেন তাহা কাব্য লিখিলেন কি বাস্তবিক ঘটনার বিবরণ দিলেন, তাহা ঠিক করা দুষ্কর। এই ঐতিহাসিক মোহ রামায়ণের কাব্যসৃষ্টি ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এই মোহাবরণ রামায়ণে যেমন বিদ্যমান, মহাভারতে ও তেমনি বিদ্যমান। সেই আখ্যান কাব্যই উৎকৃষ্ট কাব্য, যাহা ইতিহাস রূপে প্রতীত হয়, এবং সেই ইতিহাসই উৎকৃষ্ট ইতিহাস যাহা কাব্যরূপে প্রতীত হয়। অতি উৎকৃষ্ট আখ্যান কাব্য বলিয়া রামায়ণ ও মহাভারতে ঐতিহাসিক গুণ বর্ত্তিয়াছে। এইজন্য ব্রহ্মা বাল্মীকিকে বলিয়া গিয়াছেন—

"তুমি কাব্যে রামবিষয়ক যাহা বর্ণন করিবে, তাহার কিছুই মিথ্যা হইবে না"

"ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি।

বাস্তবিক রামায়ণ ও মহাভারতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। মানবের অন্তর্জগতে যাহা সত্য সত্যই ঘটিয়া থাকে, মহাকাব্যে তাহাই বর্ণিত হয়। অন্তর্জগতে যাহার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয় তাহাই প্রতীতি। রামায়ণ ও মহাভারতে সেই প্রতীতি সমুদায় সাক্ষাৎ পরিদৃশ্যমান হইয়াছে। এজন্য রামায়ণ ও মহাভারতে যাহা কাব্যাকারে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সমুদায়ই সত্য। মানবের জীবনক্ষেত্রে এই ধর্ম্মযুদ্ধের যাথার্থ প্রতিদিন প্রতীয়মান হইতেছে। ইতিহাসই মিথ্যা না হইতে পারে, কাব্য আবার মিথ্যা হইবে না, রক্ষার এই উক্তি আমরা এই রূপেই সত্য জ্ঞান করি।

মহাভারতকে কাব্য বলিয়া ব্যাসের পরিচয় দিবার কারণ আমরা পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। তিনি বোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন, রামায়ণ কাব্য হইলেও সাধারণ লোকে সচরাচর তাহা প্রকৃত ঘটনাপূর্ণ ইতিহাস বলিয়াই গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু তিনি জানিতেন, রামায়ণ এক খানি মহাকাব্য। পাছে মহাভারতও সেই রূপে সাধারণগোচর হয়, তজ্জন্য তিনি তাহার মূলেই বলিয়া গেলেন, এমত কি ব্রহ্মার সমক্ষে বলিয়া গেলেন যে, মহাভারত একখানি মহাকাব্য। নিজ গ্রন্থের এই রূপ স্পষ্ট পরিচয় দিয়া তিনি রামায়ণের কলঙ্ক-মোচন জন্য জগতে অধ্যাত্ম রামায়ণের রচনা করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতীয় কাব্য পরিচয়ের এই কারণ নির্দ্দেশ আমাদের অনুমান মাত্র।

আর একটি অনুমান এই, মহাভারতীয় ঐতিহাসিক বিবরণ এত অধিক যে, পাছে তাহার সহিত তাহার কাব্যাংশও ভেন্তিয়া যায় এজন্য বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে মহাভারতে প্রকৃত ও প্রাকৃত বিবরণ অধিক পরিমাণে থাকিলে ও মূলে তাহা কাব্য মাত্র। তাহার কোন্ অংশ কাব্য এবং তাহাতে কি কি প্রকৃত ও প্রাকৃত বিবরণ আছে, গ্রন্থের অনুক্রমণিকা ভাগেই তাহা বিশেষ করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রামায়ণে এত বিশেষ করিয়া পরিচয় দেওয়া নাই। কারণ প্রথমে বাল্মীকি, তার পর ব্যাস,—বাল্মীকি সর্ব্বাংশে ব্যাসের পথ-প্রদর্শক। বাল্মীকি অগ্রে নিজ মহাকাব্যের রচনা করিয়া জগতে যে আদর্শ দিয়া গেলেন, ব্যাস তাহার অনুসরণ করিয়া নিজ কাব্য রচনা করিলেন। সুতরাং বাল্মীকির এই নূতন সৃষ্টি-শক্তির যশ ও গৌরব জগতে চিরদিন ঘোষিত হইবে। বাল্মীকির মুখ হইতেই প্রথমে জগতে কাব্য-শ্লোক নিসৃত হইয়াছিল, তাঁহারই কাব্য প্রথমে সংগীত হইয়াছিল, এবং তাঁহারই কল্পনা হইতে সর্ব্বপ্রথমেই সম্পূর্ণ নিয়ম-নিবদ্ধ-মহাকাব্য সমুদ্ভূত হইয়াছে। বাল্মীকি শুদ্ধ যে জগতের আদিকবি ছিলেন এমত নহে, তিনি আদি কবি হইয়া মহাকাব্যেরও আদর্শ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্টি-শক্তি শুদ্ধ যে এক নূতন মহাকাব্য-কল্পনার সৃষ্টি করিয়াছিল এমত নহে, সেই কল্পনায় যে রূপ বিস্তারিত রচনার কার্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে, সে রূপ রচনাপ্রাচুর্য্য জগতে অল্পই লক্ষিত হয়। ব্যাস এই রচনাভাণ্ডার আরও বর্দ্ধিত করিয়াছেন। বাল্মীকির গৌরব আবিষ্কারে, ব্যাসের গৌরব উন্নতি-সাধনে। ব্যাস মহাকাব্যের রচনা-বিস্তৃতিতে এক মহা অন্তর্জগতের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তিনি বাল্মীকির জগতকে আরও প্রসারিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি সৃষ্টির উপর সৃষ্টি করিয়া জ্ঞানরাজ্য বাড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি বাল্মীকির মুখোজ্জ্বল করিয়া তাঁহার কীর্ত্তিপতাকা গৌরবের উজ্জ্বল বরণে জগতে প্রসারিত করিয়া গিয়াছেন। জগতের কোন্ কবি এরূপ অন্য কবির অনুসরণ করিয়া বরং তদপেক্ষা অধিকতর প্রতিষ্ঠা রাখিয়া গিয়াছেন? এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। বাস্তবিক ব্যাস ও বাল্মীকি জগতের সাহিত্য দেশে দুই অতুলনীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্রবসু।

রাধাসুন্দরী। *

(ব্রজভাব)

১

কে ওই রূপের রাশি, সংসার মাঝারে,
শতচন্দ্র পরকাশি,
মুখেতে মধুর হাসি,
উদাসী গোকুলবাসী, হেরিয়ে যাহারে;
যারে সদা ডাকে বাঁশী যমুনার ধারে?

২

ভুবন ভুলায় ওই রাধিকা সুন্দরী!
যাহারে করিয়া বুকে,
যমুনা বহিছে সুখে,
মধুর মলয় মুখে, নাচায়ে লহরী;
যথায় কদম্ব মূলে বাজিছে বাঁশরী।

৩

কারে তুমি ডাক পিক মঞ্জু কুঞ্জবনে?
ডাক বুঝি রাধিকায়,
বসন্ত এলো ধরায়,
বহিছে মলয় বায়, সৌরভের সনে;
ডাকে রাধানাথ ওই রাধিকা-রতনে।

৪

কার পানে চেয়ে আছ কুসুম সুন্দর?
দেখ বুঝি রূপ তাঁর,
যিনি সংসারের সার,
তুলনা নাহিক যাঁর, ভুবন ভিতর;
যাঁর পানে চেয়ে সদা শ্যাম মনোহর।

৫

কার রূপে বাঁধা তুমি মায়ার সংসার?
যাঁর পরমার্থ তরি,
সংসার-সাগরে ধরি,
অনায়াসে হ'তে পারি, পারাবার পার;
সে মায়ার তরি স্বধু, আছে রাধিকার।

৬

কে পারে সে মায়া-ডোর কাটাতে সংসারে?
শুনিয়া বাঁশীর গান,
আকুল যাহার প্রাণ,
যে ত্যজিতে কুলমান, অনায়াসে পারে;
সেই কাটে মায়াডোর, সংসার মাঝারে।

৭

কে পারে কলঙ্ক ডালি বহিতে মাথায়?
যে এসেছে ব্রজপুর,
সংসার করিয়া দূর,
শুনিতে বাঁশরী সুর, বকুল তলায়;
কলঙ্কের ডালি শোভে সেই রাধিকায়।

*এই কবিতায়, রাধা—মানবের সাত্ত্বিক প্রকৃতি; যমুনা—সূর্য্য তনয়া অর্থাৎ দেবপ্রসূতা প্রবৃত্তি-স্রোত; বংশীরব—শান্তিধ্বনি; কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষ—সংসার; বসন্তাদি—ধর্ম্মোৎসাহ কালীন ভাব-বিকাশ; কুসুম—সৌন্দর্য্যবোধ; গোকুল ও ব্রজপুর—অন্তর্বৈরাগ্যধাম বা ভক্ত-সমাজ; কলঙ্ক—সংসারীর কাছে বিষ্ণুভক্তবৈরাগীর কলঙ্ক; মান—ধ্যানজ ঈশ্বর-বিরহ-কাতরতা; বিদেশিনী, নাপিতানী, যোগী—মান-পরিমাণ অনুরূপ ঈশ্বরাবির্ভাব; সত্যভামা—সাত্ত্বিকী ঐশ্বর্য্য-স্বামিনী এবং কুঞ্জবন—ঈশ্বর রমণ-পুর-অন্তর্ধাম।

৮

কে পারে বাঁধিতে প্রেমে জগৎ সংসার?
যে জন করিলে মান,
সংসার আঁধার জ্ঞান,
শ্যামের প্রেমের মান, উথলে অপার;
এ জগৎ বাঁধা প্রেমে সেই রাধিকার।

৯

কার তরে বিদেশিনী, ফের এই ভবে,
হয়ে এত ব্যাকুলিত,
গাইছ কাহার গীত,
মোহিত ব্রজের চিত, শুনে গীত সবে;
পূরেছ গোকুল আজি রাধা রাধা রবে?

১০

ফিরিছ অলক্ত হাতে কারে তুষিবারে?
রঞ্জিতে রাধার পদ,
সাজাইয়া কোকনদ,
শ্যামনাম সুসম্পদ, শত শত বারে;
তাতে কি ভুলাতে পার মানিনী রাধারে?

১১

কি ধন লাগিয়া যোগি, ফের দেশে দেশে?
সে ধন অমূল্য রাই,
ভিক্ষা বিনা গতি নাই,
মাগ ভিক্ষা তাঁর ঠাঁই, যোগীবর বেশে।
ও মান-তরঙ্গে মান, সব যায় ভেসে।

১২

দুর্জ্জয় রাধার মান, অসাধ্য সাধন,
দাসীরে আশীশ কর,
স্বর্ণথালে ভিক্ষা ধর,
ছল কর যোগীবর—মান-ভিক্ষা-ধন।
ভাঙ্গিল রাধার মান চল কুঞ্জবন।

১৩

কে পারে করিতে জয় এ বিশ্ব সংসার?
বাড়াইতে যাঁর মান
চূড়া ধড়া ম্রিয়মান,
পদতলে কর-দান যে রাই রাজার,
এ বিশ্ব লুটায় পায় সেই রাধিকার।

(প্রভাস মিলন।)

১৪

আইল প্রভাসে রাই শ্যাম দরশনে,
মুখে মৃদু মৃদু হাসে,
উল্লাসে সখীরা ভাসে,
রূপে আলো করি আসে, রাধা কুঞ্জবনে।
সত্যভামা হ'ল হারা আজি শ্যামধনে।

১৫

কহে বামা সত্যভামা গিয়া কুঞ্জবনে,
রাধানামা কে সুন্দরী,
প্রভাসেতে আলো করি,
কে আজ লইল হরি, মোর কৃষ্ণধনে?
সে নামে পাগল হরি, রাজ-সিংহাসনে।

১৬

গোকুল-সুন্দরী রাই হেরিব রাধায়,
আজি আমাদের ভূপ,
সেজেছে কি অপরূপ,
শ্যামপাশে রাধারূপ, কিরূপ শোভায়?
ছেড়ে দে রে দূতি, দেখি সেই রাধিকায়।

১৭

কুঞ্জ-আড়ে দেখা যায় কেশ রাশি কার?
ওই কি রূপের রাই,
মাথায় বসন নাই,
ভূতলে পোড়েছে ধাই, সরম লজ্জার!
কিবা আলু থালু বেশ, রূপসী রাধার!

১৮

অভিমানী তুমি রাধী দেখিবে রাধায় !
কি এমন পুণ্য ধর,
দেখিবারে আশা কর,
রাধা পাশে ব্রজেশ্বর !—কহে দূতী তায়।
ত্যজ অভিমান তুমি সুন্দরী ধরায়।

১৯

কুঞ্চিত কালীম কান্তি কেশের শোভায়,
শ্যাম পাশে রূপ ধীর,
জলদে বিজলী স্থির,
হেরি শিখি-পুচ্ছ শির, শ্যামের মাথায় ;
সাপিনী কুন্তল ছলে লুটায় ধরায়।

২০

প্রভাসের কুঞ্জ আলো সেরূপ প্রভায় !
বাঁকা শ্যাম হেলে দুলে,
আছে রাধাপাশে ভুলে,
ভূষণ দিতেছে খুলে, কুসুম লতায়।
বনমালী বেশে শ্যাম রাধারে ভুলায়।

২১

ওই শুন বাজে বনে মুরারির বাঁশী।
সংসার কানন মাঝে,
যবে ও বাঁশরী বাজে,
ত্যজি মান কুল লাজে, গোকুল নিবাসী ;
সবাই ও শান্তিরবে হয় গো উদাসী।

২২

কত সুধা আছে ওই বাঁশরীর গানে,
সিংহাসনে বসি রামা,
কিজানিবে সত্যভামা ?
এ মায়া-সঙ্গীত রামা, তোমাদের কাণে ;
কখন পশিত যদি শিহরিতে প্রাণে।

২৩

বাজিত ও বাঁশী যবে গোকুলের বাগে,
উছলি যমুনা জল,
নাচিয়া তরঙ্গ দল,
বহিয়াছে কল কল, মাতিয়া উল্লাসে।
সাধে কি দেখিতে আসি রাধিকা-বিলাসে ?

২৪

অনুপম রাধাশ্যাম যুগল-মিলন।
প্রকৃতি সুন্দরী রাধা,
পুরুষের প্রেমে বাঁধা,
আধ রূপ আধ আঁধা, রূপ অতুলন !
সে রূপ কি সত্যভামা পাবে দরশন ?

২৫

অভিমানী রাজরাণী দেখিতে মিলন,
নয়ন খুলিল যেই,
শ্যাম আলো করি সেই,
দেখিতে দেখিতে নেই, হ'ল অদর্শন।
শোভিল গোলোকে রাই, রাধিকা-রমণ।

পূর্ণচন্দ্র বসু—

কলিকাতার জল বায়ু।

যদিও কলিকাতা উষ্ণ কটিবন্ধ বা গ্রীষ্ম মণ্ডলের (Torrid Zone) প্রায় সীমার নিকট এবং কর্কট ক্রান্তির (Tropic of Cancer) এক অক্ষাংশ (degree) মধ্যে স্থাপিত, তথাচ ইহার জল বায়ু (Climate) প্রকৃত পক্ষে গ্রীষ্ম-প্রধান (Tropical)। বিষুব রেখা

সন্নিহিত স্থান সমূহের শীত গ্রীষ্মের যেরূপ তারতম্য লক্ষিত হয়, উত্তরায়নান্তবৃত্তান্তর্গত স্থান সমূহে তদপেক্ষা অধিক নূন্যাধিক্য লক্ষিত হয় না ; সেই কারণ বশতঃ মান্দ্রাজ প্রভৃতি অন্যান্য বিষুবরেখার সন্নিকটস্থ স্থান গুলি অপেক্ষা কলিকাতার জল বায়ু অল্প এক-ভাবাপন্ন দেখা যায়। সমুদ্রের সান্নিধ্যবশতঃ কলিকাতাবাসিগণকে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল অথবা ভারতীয় অপরাপর আভ্যন্তরীণ দেশবাসিগণের ন্যায় ঋতু সকলের আতিশর্য্য অনুভব করিতে হয় না। এস্থানে তিনটী ঋতুর প্রভাব বিশেষ রূপে লক্ষিত হয় ; গ্রীষ্ম ঋতু, চৈত্র মাস হইতে আষাঢ় মাসে বৃষ্টির আরম্ভ পর্য্যন্ত, বর্ষা ঋতু, সচরাচর আষাঢ় মাসে আরম্ভ হইয়া ভাদ্র-মাস পর্য্যন্ত ও কখন কখন আর ও অধিক দিন স্থায়ী হইতে দেখা যায়, এবং শীতঋতু, অগ্রহায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া মাঘ মাসের শেষ পর্য্যন্ত অনুভূত হইয়া থাকে। বৎসরের মধ্যে অগ্রহায়ণ মাসের শেষ এবং মাঘ মাসের প্রথমাংশে সচরাচর শীতের প্রকোপ অধিক দৃষ্ট হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসেই রৌদ্রের প্রখরতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সমস্ত বৎসরের গড় উষ্ণতা ৭৯·৪°। গ্রীষ্ম (ক) ৮৪·৫° বর্ষা ৮৩·৩° এবং শীতঋতুর ৭১·৫° গড় উষ্ণতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে ১৮৬৭ এবং ১৮৭৩ মে মাসে এই দুইবার ছায়া মধ্যে সর্ব্বোচ্চ ১০৬° এবং ১৮৭৪ জানুয়ারী মাসে খোলার চালের নিম্নে ৫১·৪° উষ্ণতা লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে যে সময়ে বাতাস প্রধানতঃ পশ্চিম এবং দক্ষিণ পশ্চিম (নৈঋত কোণ) দিক হইতে বহিতে থাকে, এবং সময়ে সময়ে উহার উত্তাপ ১০০°উপরে ও উত্থিত হয় ; ঐ সময়ে কলিকাতাবাসিগণ সুমধুর সমুদ্র-বায়ু উপভোগ করিতে পারেন। আভ্যন্তরীণ দেশসমূহবাসিদিগের এ সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে না। উক্ত বায়ু প্রায়ই অপরাহ্নে আরম্ভ হইয়া সূর্য্যাস্তের পর কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া থাকে। সচরাচর পশ্চিম কিম্বা উত্তর পশ্চিম (বায়ুকোণ) হইতে জোর বায়ু (খ) আসিয়া এই সময়ের উত্তাপের আতিশর্য্য উপশমিত করিয়া থাকে। ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অত্যন্ত প্রবল বায়ুর হল্কা প্রবাহিত এবং ধুলা রাশি উত্থিত হইয়া ঝটিকার আগমন বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করে। এই ঝটিকার সময় প্রায়ই প্রচণ্ড বিদ্যুৎ ঘন ঘন চমকিত হইতে থাকে, এবং বৎসরের এই সময়ে প্রায়ই অনেক ক্ষণ ধরিয়া বজ্রপতন হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতার বায়ুর আর্দ্রতার (humidity) পরিমাণ সচরাচর কিঞ্চিৎ অধিক বলিয়া বিবেচিত হয়। বায়ুর আর্দ্রতা দ্বিবিধ নিরপেক্ষ (positive) এবং আপেক্ষিক (relative) এই উভয়বিধ আর্দ্রতার যে বিশেষ প্রভেদ আছে তাহা আমরা এস্থলে বুঝিবার চেষ্টা করিব। বায়ুতে ঠিক যে পরিমাণ (actual quantity) জলীয় বাষ্প বা জল কণা থাকে, এবং যাহা বায়ুর বিস্তৃতি অনুসারে পরিমিত হয় তাহাই নিরপেক্ষ

(ক) জ্যৈষ্ঠ মাসের গড় উষ্ণতা ৮৮৯

(খ) ইহাকে (North-Western উত্তর পশ্চিমী) ঝটিকা (storm বলিয়া থাকে।

আর্দ্রতা। বায়ুতে কত অংশ শুষ্ক বায়ু এবং কত অংশ জলীয় বাষ্প বা জলীয় কণা আছে তাহারইপরিমাণের নাম আপেক্ষিক আর্দ্রতা। ব্লানফোর্ড সাহেব নির্ণয় করিয়াছেন যে, সমস্ত বৎসর কলিকাতার বায়ুর এক সহস্রাংশে গড় ৭৬২ পরিমাণ জলীয় বাষ্প বা জল কণা থাকে, অন্যত্র লণ্ডন নগরে কেবল ১৭৬ মাত্র। (গ) কলিকাতার সঙ্গে তুলনা করিলে লণ্ডন নগরের বায়ুর জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অর্দ্ধেকের ও কম। কিন্তু যদ্যপি কলিকাতার সঙ্গে লণ্ডন নগরের বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা (relative humidity) তুলনা করা যায়, তাহা হইলে (বায়ুর আর্দ্রতার পূর্ণমাত্রা (saturation) ১ সংখ্যা হইলে কলিকাতার বাৎসরিক আপেক্ষিক আর্দ্রতা গড় ৭৬ হয় এবং লণ্ডন নগরে উহার পরিমাণ ৮৯ হয়। ইহাতে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে কলিকাতা অপেক্ষা লণ্ডন নগরের বায়ুর জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অধিক হইয়া পড়ে। অর্থাৎ বায়ুর আর্দ্রতার পূর্ণমাত্রা (suturation) যদ্যপি এক ১ সংখ্যা হইল এবং কলিকাতার বায়ুতে ৭৬ অংশ জলীয় বাষ্প থাকিল তাহা হইলে উহার পূর্ণ মাত্রা প্রাপ্ত হইতে হইলে ২৪ অংশ পরিমাণ জলীয় বাষ্পের আবশ্যক। কিন্তু অন্যত্র লণ্ডন নগরে আর্দ্রতার পরিমাণ ৮৯ তাহা হইলে উহার পূর্ণমাত্রা পাইতে হইলে কেবল ১১ অংশ পরিমাণ জলীয় বাষ্পের আবশ্যক। এক্ষণে পরিষ্কার রূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, যদ্যপি কলিকাতার সহিত লণ্ডন নগরের আপেক্ষিক আর্দ্রতার তুলনা করা যায়, তাহা হইলে লণ্ডন নগরের বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কলিকাতা অপেক্ষা অধিক হইয়া পড়ে। তাহা হইলে প্রতিপন্ন হয় যে কলিকাতা অপেক্ষা লণ্ডনের বায়ুর আর্দ্রতা অধিক। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে এবং কেন যে নহে সে বিষয়ের বিচার আমরা এ স্থলে করিব না; কারণ উহা আমাদিগের অনুসন্ধানের সীমার বহির্ভূত। যদ্যপি কোন পাঠকের উহা জানিবার কৌতুহল জন্মে তাহা হইলে উক্ত বিষয় অন্যত্র পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন।

পরিশেষে পূর্ব্বোক্ত নিরপেক্ষ আর্দ্রতা মতানুসারে লণ্ডন নগরের অপেক্ষা কলিকাতার বায়ুর আর্দ্রতা যে অধিক এই তত্ত্বটী সমর্থনের জন্য আমরা দুই একটী কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব। অনেকেই অবগত আছেন যে আমরা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য সর্ব্বদা যে বায়ু গ্রহণ করি তাহাতে যদ্যপি জলীয় অংশের পরিমাণ অধিক থাকে, তাহা হইলে উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অধিক হানিকর হয়, সেই জন্যই লণ্ডন নগর অপেক্ষা কলিকাতার স্বাস্থ্য অধিক মন্দ এবং সেই কারণে উভয় প্রদেশের মনুষ্যের গঠন ও আয়ু প্রভৃতির এত দূর প্রভেদ। ইহাতে আমরা এরূপ বলিতেছি না যে এই একটী কারণ বশতঃই উক্ত প্রভেদ ঘটিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেক কারণ ও আছে বটে, কিন্তু ইহাকে একটী প্রধান কারণ বলা যাইতে পারে। ব্লানফোর্ড সাহেব বলেন যে "শীতোষ্ণতা (temparature) ব্যতীত

(গ) Vide Pro. As. Soc., B., Novr 1873.

বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের তারতম্যই স্থান বিশেষের স্বাস্থ্যভেদের প্রধান কারণ"।

কলিকাতার বাৎসরিক গড় ৬৮·৪ ইঞ্চি বৃষ্টি পড়িয়া থাকে (ঘ) অন্যত্র কলিকাতার ৫০ ক্রোশ নিম্নে সাগর দ্বীপে উহার অপেক্ষা অনেক অধিক বৃষ্টি হয়। উহার পরিমাণ ৮২·২৯ ইঞ্চি। বাৎসরিক বৃষ্টি পতনের বিষয় যত দূর লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয়; উহার পরিমাণ ৯২·৩১ ইঞ্চি (ঙ) এবং বিগত ৪৭ বৎসরের মধ্যে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ৪৩·৬১ ইঞ্চি মাত্র বৃষ্টি পড়িয়াছিল। এই পরিমাণ বাৎসরিক গড় বৃষ্টি-পতনের অর্দ্ধেক বলিয়া বিবেচিত হয়। এই স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে কলিকাতায় যে বৎসর বৃষ্টির পরিমাণ নিতান্ত অল্প হয় সে বৎসর উত্তর ও উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের নিশ্চয় লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। ইহার কারণ এই যে মেঘ সকল সমুদ্রের দিক হইতে আসিয়া বঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়া তৎপরে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলাভিমুখে গমন করিয়া থাকে। যে বৎসর বঙ্গদেশে মেঘ অল্প আইসে ও বৃষ্টির পরিমাণ অল্প হয়, সে বৎসর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অত্যন্ত অল্প মেঘ যাইয়া থাকে সুতরাং উক্ত স্থানে বৃষ্টির পরিমাণ অত্যন্ত অল্প হইয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে ঐ বৃষ্টির পরিমাণ এত অল্প হয় যে উহাকে এক প্রকার আনাবৃষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফলতঃ অনাবৃষ্টি বশতঃ শস্যের অভাবে কখন কখন দুর্ভিক্ষ পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে এবং উহার পরের বৎসর কলিকাতার বাৎসরিক গড় ৫২·৯৯ এবং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ৫২·৬১ ইঞ্চি পরিমাণ বৃষ্টি হওয়া প্রযুক্ত উত্তর বাঙ্গালায় শস্যের অত্যন্ত অভাব হয়। শ্রাবণ মাসের শেষ ভাগে বৃষ্টির পরিমাণ অধিক হইয়া থাকে অর্থাৎ গড় ৪১·১৮ ইঞ্চি এবং পৌষ মাসের শেষে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প হয় উহার পরিমাণ গড় ০·২৪ ইঞ্চি মাত্র।

কলিকাতার গড় বায়ু ভার (atmospheric pressure) সমুদ্র সমতল হইতে ১৮ ফিট এবং বায়ুমাণ যন্ত্রে ২৯·৭৯২ ইঞ্চি উচ্চে দেখিতে পাওয়া যায়। ডিসেম্বর মাসে ইহার উচ্চতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। ঐ সময়ে ৩০·০৪১ ইঞ্চি উর্দ্ধে উত্থিত হয়, এবং জুন ও জুলাই মাসে সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নে অবরোহণ করে; এই সময়ে ইহার নিম্নতা ২৯·৫৫১ ইঞ্চি হয়। এস্থলে বলা আবশ্যক যে বায়ুমাণ যন্ত্র দিবারাত্রে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুই বার আরোহণ ও অবরোহণ করিয়া থাকে এবং এই বায়ুমাণ যন্ত্রের জোয়ার ভাঁটা ঘড়ীর কাঁটায় কাঁটায় ঠিক নিয়মিত রূপে ঘটিতে দেখা যায়। ফাদার লাফোঁ (Father Lafont) বলেন যে "প্রায় রাত্রি চার ঘটিকার সময় হইতে বায়ুমাণ যন্ত্রের পারদ ধীরে ধীরে ও স্থির ভাবে আরোহণ করিতে থাকে। এই রূপে ক্রমশঃ দিবা

(ঘ) Vide Table of Average monthly and Annual Rainfall in Northern India. By Mr. Blanford.

(ঙ) ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১১মে তারিখে ৩ ঘণ্টার ১২ ইঞ্চি বৃষ্টি পড়িয়া ছিল। যতদূর লিপিবদ্ধ আছে, এই পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

সাড়ে নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত উঠিয়া পুনর্ব্বার ক্রমশঃ অবরোহণ করিতে থাকে। এই রূপে অপরাহ্ণ চার পাঁচ ঘটিকার সময় বায়ুমাণ যন্ত্রের নল মধ্যে ক্রমশঃ নামিতে থাকে। উক্ত প্রকারে আমরা দিবা রাত্রের প্রায় ঠিক একই সময়ে উক্ত জোয়ারের দুই বার হ্রাস ও বৃদ্ধি দেখিতে পাই"।

কলিকাতার জল বায়ু ও ঋতু প্রভৃতি স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিষয় সমূহের শেষ করিবার পূর্ব্বে চক্র-গতি-শীল (rotary) ঝড়ের বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক। এতদ্দেশবাসিগণ বিশেষ রূপে অবগত আছেন যে সময়ে সময়ে ভীষণ ঝটিকা ও বাত্যা দ্বারায় সমুদ্র নিকটস্থ বঙ্গদেশান্তর্গত স্থান সমূহের কত দূর অনিষ্টাপাত হইয়া থাকে। এই মহতী ঝটিকা প্রভাবে বন্দরস্থ বাণিজ্য পোত দূরে নিক্ষিপ্ত, বৃক্ষাদি উৎপাটিত, অট্টালিকা সমূহ ভূমিসাৎ এবং বিশেষতঃ সহস্র সহস্র মনুষ্য জীবনের হানি করিয়া সময়ে সময়ে এতদ্দেশের যে কি ভয়ানক অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে তাহা বঙ্গবাসীর অবিদিত নাই। ইদানীন্তন কালে যে কয়েকটি ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে এবং তদ্দ্বারা এদেশের যে কি পরিণাম অমঙ্গল সাধিত হইয়াছে তাহা এখন ও স্মৃতি পটে উদিত হইলে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। ঐ সকলের বিষয় আমরা পশ্চাতে উল্লেখ করিব। এক্ষণে কেবল মাত্র আমরা যে সকল বাৎসরিক ঝটিকা প্রভৃতি নিয়মিত রূপে ঘটিয়া থাকে সেই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব। ইহা প্রতি বৎসর দুইটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘটিয়া থাকে। প্রথম নৈঋতী মৌসুমী বায়ু আরম্ভ হইবার সময় এবং উহার শেষ হইবার সময় (চ) পূর্ব্বোক্ত সময়ে যে ঝটিকা আরম্ভ হয় উহা প্রায় সচারাচর আগামন দ্বীপ পুঞ্জের কিঞ্চিৎ উত্তর হইতে উত্থিত হয় এবং ইহা আরম্ভ হইবার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে বায়ুমাণ যন্ত্রের স্থির ভাবে অধিক পরিমাণে অবরোহণ হইতে দেখা যায়; ইহাই উক্ত ঝটিকারম্ভের জ্ঞাপক। শেষোক্ত সময়ে যে ঝটিকারম্ভ হয় উহা বঙ্গোপসাগরের কিছু দূর হইতে উত্থিত হয়; কিন্তু উহার আগমনের পূর্ব্বে বায়ুমাণ যন্ত্রের দ্বারায় কিছু অবগত হওয়া যায় না। এই ধ্বংশকারী ঝটিকা সমূহ প্রথমে পূর্ব্বোক্ত স্থানদ্বয়ের যে স্থান হইতে উত্থিত হয় সেই স্থানেই দুই তিন দিবস অবস্থিতি পূর্ব্বক ইহার সম্পূর্ণ বল সংগ্রহ করিতে থাকে, তৎপরে বায়ুকোণাভিমুখে উহার গতি আরম্ভ হয় এবং ক্রমশঃ যেমন উহা অগ্রসর হইতে থাকে উহার বল ও ভীষণতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই ঝটিকার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ (ছ) অত্যন্ত প্রবল বায়ু সমষ্টির দ্বারায় বেষ্টিত থাকে এবং ঐ বায়ু সমূহ উক্ত প্রদেশের চতুর্দ্দিকে চক্রবৎ ঘূর্ণিত হয় এবং সজোরে মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে প্রবেশ করিতে থাকে। যখন এই রূপ ঝটিকার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ যে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের (জ) উপর দিয়া গমন

(চ) চৈত্র বা বৈশাখ মাস অবধি ভাদ্র বা আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত।

(ছ) এই স্থানে সম্পূর্ণ স্থিরতা বিরাজ করে। ইহাকে 'ঝটিকাক্ষ' (Eye of the Storm) বলিয়া থাকে।

(জ) কলিকাতার যখন ঝড় হয় তখন উহা পূর্ব্বে কিম্বা পূর্ব্ব ও ঈশান কোণের (E. N. E.) মধ্য দিক হইতে আসিয়া থাকে।

করিবে তাহার পূর্ব্বে বায়ু একটি নির্দ্দিষ্ট দিক হইতে বহিতে থাকেএবং উহার বেগ ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরে ঐ মধ্য প্রদেশ (central calm) ঐ স্থানের উপর আসিয়া পৌঁছে। যখন আসিয়া পৌঁছে তখন সেই স্থানের বায়ুর কোন গতি থাকে না। উহা স্থিরভাব গ্রহণ করে। তৎপরে আবার যে দিক হইতে বায়ু বহিতে ছিল তাহার বিপরীত দিক হইতে ভয়ানক বেগে ঝটিকা প্রবাহিত হইতে থাকে এবং ইহার বেগ ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ২ই অক্টোবরের পরে আর এরূপ ঝটিকার মধ্যপ্রদেশ কলিকাতা অতিক্রম করে নাই (ঝ) কিন্তু ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে যে ঝড় হয় ঐ সময়ে উহার মধ্য প্রদেশ কলিকাতার কয়েক মাইল পশ্চিম দিয়া অতিক্রম করিয়া ছিল; উহাতে ও কলিকাতা নগরের যথেষ্ট অনিষ্ট ঘটিয়া ছিল। কলিকাতার নিম্নে ভাগীরথীতে যে সমস্ত জাহাজ নঙ্গর করা ছিল ঐ সকলকে নঙ্গর হইতে বহুদূরে তাড়িত করিয়া লইয়া গিয়াছিল এবং উহার মধ্যে অনেকগুলি ভগ্ন হইয়াছিল। উক্ত ঘটনার পর হইতে বাণিজ্য তরী সংক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য এক প্রকার ঝটিকা-সঙ্কেত (storm signal) স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে ঝটিকা হইবার পূর্ব্ব-লক্ষণ হইলেই কলিকাতার ভাগীরথীর নিম্নস্থ আর তিনটী নির্দ্ধারিত স্থানে উক্ত প্রকার ঝটিকা-সঙ্কেত প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত।

(ঝ) Seventh memoir on the Law of storn "by Mr. H. Peddington—Vide fournel As: Soc: Bengal. Vol: XI.

রাখাল বালকের গান।

(মুলতানী-বাহার)।

(১)

বন-ফুলের হার পরিয়ে গলে এমনি ক'রে
মদন মোহন,
বৃন্দাবনে রাখাল সনে ফুল্ল মনে খেল্‌ত
কেমন॥
শ্রীদাম সুদাম মনের সাধে,
খেল্‌ত কত ভাবের ছাঁদে,
ভক্তি-কুসুম ঢেলে দিত কানুর পদ-
কোকনদে;
আড়াল থেকে বলাই দাদা কর্ত্তো সে
ভাব দরশন॥

(২)

এমনি যত ধবল শ্যামল—বাঁশীর রবে
আকুল হ'য়ে,
হাম্বা রবে ধেয়ে যে'ত— কি জানি কি
আদর পেয়ে।
রুনু রুনু ঝুনু নুপুর বোলে,
গোপিনী কুল যে'ত গ'লে,
প্রাণের কানু বাজিয়ে বেণু আন্‌ত ধেনু
দলে দলে;
কাল-স্রোতে সব ভেসেছে শুধুই আছি
নিয়ে স্মরণ॥

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বাল্য-বিবাহ। *

(প্রথম প্রস্তাব)

হুতম পেঁচা বলিয়া গিয়াছেন "আজব সহর কলিকাতা"—হুজুক কলিকাতার প্রাণ। এত বড় সহর একটা হুজুক না লইয়া কি থাকিতে পারে? এক্ষণকার সাহিত্য-জগতের হুজুক বাল্যবিবাহ। হুজুক বলিবার কারণ এই, বাল্যবিবাহের আন্দোলন যেরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, সেরূপ আন্দোলনের কোন আবশ্যকতা ছিল না, অথচ তাহাই লইয়া একটা হৈ চৈ হইয়াছে। এ আন্দোলনের সূত্রধার যাহা তাহার উদ্দেশ্য প্রকাশ্যসভায় আন্দোলন করিয়া সুসিদ্ধ হইতে পারে না, বরং তদ্রূপ আন্দোলনে সেই উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাঘাত ঘটে। সে উদ্দেশ্য শোভাবাজারের রাজবাটীতে বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে যে দ্বিতীয় সভা হয় তদ্দ্বারা অনেক পরিমাণে সুসিদ্ধ হইয়াছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে ঐরূপ স্থিরভাবে নির্দ্বন্দ্ব হিন্দু শাস্ত্রীয় মতামত গ্রহণ করিয়া রাজসমীপে তাহা প্রেরণ করাই যথেষ্ট। সে বিষয় লইয়া প্রকাশ্য সভায় আপনাপনি একটা ঘরওয়া বিবাদ করিলে বরং আপনাদিগেরই পায়ে কুড়ুল মারা হয়। সেরূপ আন্দোলনের হুজুক না তুলিয়া নিরস্ত হওয়াই আমাদের উচিত ছিল। আন্দোলন করিবার সময় আছে। এক্ষণে আর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই সুতরাং আন্দোলনের অসময় নহে।

আরএক কারণে বাল্যবিবাহের আন্দোলন অনাবশ্যক। এক্ষণে বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে যে বাগ্‌বিতণ্ডা হইতেছে, তাহা শুদ্ধ মেয়েদের বিবাহ লইয়া আন্দোলন। কিন্তু পূর্ব্বে যে রূপ বালিকা-বিবাহের রীতি ছিল, এক্ষণে তাহার অনেক শিথিলতা আপনাপনি ঘটিয়া আসিয়াছে। এখন অনেক কারণে ভদ্রসমাজে বালিকা-বিবাহ ১০। ১১ বৎসরের নীচে হয় না বরং তদূর্দ্ধে কোন কোন স্থলে ঘটিয়া থাকে। নিতান্ত উপযুক্ত পাত্রাভাবে দুই একটি বালিকার বিবাহ কাল ঐ সময় অতীত হইয়া যায়। কিন্তু তাহা নিয়ম নহে নিয়মের নিপাতন। অনেক কারণে আমাদিগকে অত্যন্ত বাঁধাবাঁধি ছাড়িয়া দিয়া বর্ত্তমান উদার নীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। যেরূপ সমাজের গতি, তাহাতে অনুমান হয় সেই উদারতা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু সে গতি কেহ রোধ করিতে পারে না। যেহেতু পরিবর্ত্তনই সমাজের নিয়ম। পরিবর্ত্তনেই সমাজের স্থিতি, গতিই স্থিতির নিদান। সমাজ কখন একভাবে ছিল না, কখন থাকিবেও না। পরিবর্ত্তন তাহার অখণ্ডনীয় নিয়ম ও প্রাণ। যে নিয়মে সমাজ দেশ কাল পাত্রের উপযোগী হইয়া গড়িয়া আইসে, সে নিয়ম ধীরে ধীরে নীরবে নীরবে অসংখ্য কারণ-বলে দুর্নিবার বেগে সমাজের গতি ফিরাইয়া দেয়। সমাজের অন্তরে অন্তরে যে নানা স্রোত চলিতেছে, এই সমস্ত কারণ সেই স্রোতে উপস্থিত হয়। এই আভ্যন্তরীণ স্রোত কাল-প্রবাহে চলিয়া আসিতেছে। সে স্রোত দুর্নিবার ও কালের অনন্তদেশে মিলিয়া গিয়াছে। উহার আদি ও অন্ত কোথায়, কেহ বলিতে পারে না। সুতরাং এই স্রোতে যে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তাহা সামাজিক আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন। সে পরিবর্ত্তন কাহার হাত-ধরা নহে। কাহার কথার উপর সে পরিবর্ত্তন নির্ভর করে না। সেই আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তনের নিয়মানুসারে বালিকা-বিবাহের এক্ষণে অনেক শিথিলতা ঘটিয়াছে। যাহারা বালিকা-বিবাহের ওকালতি করিতেছেন তাঁহারা ও সেই শিথিল নিয়মেরই পোষকতা করিতেছেন মাত্র। অন্যরূপ বলিবার যো নাই। কারণ, সমাজের আভ্যন্তরিক বেগ প্রতিরুদ্ধ করা অসাধ্য। অতএব, বাল্যবিবাহ যখন আপনাপনি উঠিয়া যাইতেছে, যখন বাল্যবিবাহের উকিলগণ সেই শিথিল নিয়মের পোষকতা ভিন্ন আর কিছু করিতে পারেন না, তখন আর তদ্বিষয়ে আন্দোলনের কি ফল? মিছা মিছি, আপনাপনি বিবাদ করা মাত্র।

বাল্যবিবাহপক্ষে এ পর্য্যন্ত যত আন্দোলন ও চীৎকার করা হইয়াছে, তাহাতে বালিকা-বিবাহ সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান নিয়মেরই পোষকতা হইয়াছে। উকিলগণের জানা উচিত ছিল যে, বর্ত্তমান নিয়ম পূর্ব্বকালের নিয়মের পরিবর্ত্ত মাত্র। অতএব তাহারা পাকতঃ সেই পরিবর্ত্তনেরই পোষকতা করিয়াছেন। সুতরাং পরিবর্ত্তিত নিয়মের পোষকতা করিয়া তাঁহারা আত্মপক্ষই হীনবল করিয়াছেন। বর্ত্তমান যখন অতীতের ফল, তখন বর্ত্তমানকে সমর্থন করিতে গেলে ভবিষ্যৎকেও সমর্থন করিতে হয়। কিন্তু ভবিষ্যতে যে অনেক পরিবর্ত্তন হইবে, বর্ত্তমানই তাহার প্রমাণ। যখন পরিবর্ত্তিত বর্ত্তমান সমর্থিত হইল, তখন পরিবর্ত্তিত ভবিষ্যৎও যে সমর্থিত হইবে তাহার আর বিচিত্রতা কি!

যাঁহারা বাল্যবিবাহের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন, তাহাদিগকে তৎপক্ষীয় উকিল বলিবার একটু কারণ আছে। উকিলেরা যেমন স্বপক্ষে যত কথা বলা যাইতে পারে তাহা বলেন, বিপরীত পক্ষের কোন কথার উল্লেখ করেন না, যদি করেন, সুবিধামত করেন, অর্থাৎ যাহা খণ্ডন করিতে পারিবেন এমত কথাই গ্রহণ করেন, অন্য কোন কথা গ্রহণ করেন না, কেবল আপনার কথাই পাঁচকাহন করিয়া যান, বাল্যবিবাহ পক্ষীয় আন্দোলনকারিগণ তাহাই করিয়াছেন। বিগত কার্ত্তিক মাসের "নবজীবনে" "হিন্দু-বিবাহ" * শীর্ষক যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, যাহা প্রকাশ্য সভায় পূর্ব্বে পঠিত হইয়াছিল,

* আমরা এই প্রস্তাব-লেখক হইতে যে পত্রখানি পাইয়াছি, তাহা উদ্ধৃত করিলাম। বিঃ প্রঃ

"মহাশয়, সামাজিক প্রস্তাব এক্ষণে আমাদের সমাজে প্রধান বিচার্য্য বিষয় হইয়াছে। কিন্তু এমত কাগজ প্রায় দেখা যায় না যাহাতে পক্ষাপক্ষ সমভাবে আন্দোলিত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে আপনার উদারতা দেখিয়া এই প্রস্তাবটি পাঠাইলাম। বিভাতে ইহাকে স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন। প্রস্তাবটি অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়াতে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিতে বাধ্য হইলাম।"

* 'হিন্দু বিবাহ' নাম না দিয়া "বর্ত্তমান কালের বালিকা-বিবাহ" নাম দেওয়াই উচিত ছিল।

সেই প্রবন্ধ এই ওকালতির প্রধান দৃষ্টান্ত। প্রবন্ধ-লেখকের প্রধান বল যুক্তি; কিন্তু তিনি শাস্ত্রবিধি উল্লেখ করিতেও ত্রুটি করেন নাই। শাস্ত্রবিধি বিধি মাত্র। হয় সেই বিধি লও, নহিলে যুক্তি লও। শাস্ত্র লইতে গেলে যুক্তি ছাড়িয়া দাও। যুক্তি লইতে যাও, শাস্ত্র ছাড়িয়া দাও। যুক্তির উপর শাস্ত্রকে স্থাপন করিতে গেলে শাস্ত্র মহা বিবাদ-ভূমি হইয়া পড়ে। তাহা হইলে শাস্ত্র আর বিধি থাকে না। লেখক আপনার যুক্তি মার্গের সুবিধা অনুযায়ী শাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। শাস্ত্রকে তিনি নিজ মতের পরিপোষক করিয়াছেন মাত্র। যেখানে নিজ মত শাস্ত্রের সঙ্গে না মিলিয়াছে সেখানে আর শাস্ত্রকে গ্রহণ করেন নাই। পাত্র ও কন্যা নির্ব্বাচন প্রণালী সম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু শাস্ত্র কথা যদি একবার অগ্রাহ্য হয়, তবে সে শাস্ত্র সকলই অগ্রাহ্য। তিনি বর্ত্তমান কালের বালিকা-বিবাহ-প্রণালীকে সমর্থন করিবার জন্য শাস্ত্র বিশেষের অভিপ্রায় দেখিতে গিয়াছেন। শাস্ত্রের সমুদায় দেশ খুঁজিলে কি দাঁড়ায় তাহা দেখেন নাই। এরূপ করা কি ওকালতি নয়? শাস্ত্রকে মতের পরিপোষক করিতে গেলে শাস্ত্রের মর্য্যাদা যায়। শাস্ত্রের ভাণ করিয়া নিজ মতের পোষকতা করিতে গেলে যে লাভ আছে, সে লাভ সেই কৌশল প্রকাশ হইয়া গেলেই বিনষ্ট হয়। একদেশদর্শী হইলে শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বাহির হয় না। শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বাহির করিতে চাও, সমুদায় শাস্ত্র গ্রহণ কর। মনুকে লও এবং তৎসঙ্গে সকল স্মৃতিকারকেও গ্রহণ কর। আবার যদি মনুকে লও, মনুর সকল বিধান আলোচনা করিয়া তবে তাৎপর্য্য বাহির কর। নহিলে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বাহির করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই রূপ অনেক দোষ যে প্রস্তাব-লেখকের ঘটিয়াছে তাহা আমরা ক্রমশঃ প্রদর্শন করিতেছি; এবং তজ্জন্যই তাহার প্রস্তাবকে ওকালতি বলিয়াছি। তিনি এক্ষণকার বালিকা-বিবাহ সমর্থন করিবার জন্য এই মতের সৃজন করিলেন যে প্রাচীন হিন্দুদের বিবাহ আধ্যাত্মিক ছিল। এই আধ্যাত্মিকতা অনেক টানাটানি করিয়া এখন বজায় রাখিতে হইতেছে। এই আধ্যাত্মিকতা বজায় রাখিবার জন্য তিনি অনেক কথায় একদেশদর্শিতার বিলক্ষণ পরিচয় দিতেছেন। যে আধ্যাত্মিকতা লইয়া এত হৈ চৈ পড়িয়াছে, দেখা যাউক, তাহা প্রস্তাব-লেখক কিরূপে সমর্থন করিয়াছেন। এই সমস্ত আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একটি কথা বলিয়া রাখা উচিত, আমরা লেখকের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিতেছি বলিয়া কেহ যেন না মনে করেন, আমরা বর্ত্তমান বালিকা-বিবাহের বিরোধী; আমরা বর্ত্তমান বিবাহের বিরোধী নহি, কিন্তু লেখক যেরূপে সেই বিবাহকে সমর্থন করিয়াছেন তাহার বিরোধী। আমরা কেবল লেখকের যুক্তি-পথের বিরোধী।

লেখক বলেন, প্রাচীন হিন্দু বিবাহ করিয়া মুক্তি পথের পথিক হইতেন বলিয়া তাহার বিবাহ আধ্যাত্মিক। লেখক মনুর সময়ের বিবাহ বিধি ধরিয়া হিন্দু বিবাহকে

আধ্যাত্মিক বলিয়াছেন, সুতরাং সেই মনু লইয়াই আমাদিগেরও কথা কহা উচিত। যখন মনুর বিধি সকল অপ্রচলিত হইয়াছে, বলিতে গেলে, বিবাহ সম্বন্ধে তখন মনু পরিবর্জিত হইয়াছেন। যখন মনু পরিবর্জিত হইয়াছেন, তখনকার রীতিকে মনুর বিধি দিয়া বিচার করা যুক্তিযুক্ত নহে। অতএব, আমরা দেখিব মনুর বিবাহ বিধি সকল আধ্যাত্মিক ছিল কি না। মনুকে লইতে গেলে মনুর সকল বিধান দেখা উচিত। যখন মনু অপ্রচলিত হইয়াছেন, যখন সমাজ বিভিন্ন রূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তথাকার কালের বিবাহ রীতিকে মনুর কোন বিধি-দিয়া বিচার করা কি অন্যায় নহে? মনুকে লও, তাঁহার সমুদায় সংহিতা লও, না লও তাঁহাকে একেবারে ছাড়িয়া দেও। যুক্তি এই কথা বলে।

আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যে বিবাহরীতি প্রচলিত হইলে যে রূপ হওয়া উচিত, আমরা প্রাচীন মনুর কালে তাহার পরিচয় পাই না। মনুর সময়ে আমরা দেখিতে পাই অষ্টবিধ বিবাহরীতি প্রচলিত ছিল। সমাজে যত প্রকার বিবাহরীতি সম্ভবিতে পারে, প্রায় সকল প্রকারই এই অষ্ট বিধ প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। অথচ এই অষ্টবিধ প্রণালীই হিন্দু বিবাহ। এত প্রকার হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য কি একই হইতে পারে? দুই একটি বিবাহ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত রীতিতে দেখা যায় লোকে বরং ইতর কামনা পরতন্ত্র হইয়া বিবাহ করিত। মনুর সময়ে পাত্র নিজে বিবাহ করিত। তখন দ্বিজ গুরুর আজ্ঞালাভ করিয়া যথাবিধি স্নান ও সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক সজাতীয়া ও সুলক্ষণা ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিতেন।

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাং।
৩অ, ৪ শ্লোক।

কাহাকে সুলক্ষণা কন্যা বলা যাইত! যদ্দ্বারা আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য ভাল রূপে সিদ্ধ হইতে পারে তাহাকে কি সুলক্ষণা বলা যাইত? তা হলে ত বিবাহ আধ্যাত্মিক হইত। কিন্তু হা অদৃষ্ট! সেরূপ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই সুলক্ষণা ও হৃদ্যা কন্যাকে মনু এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন।

অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংসবারণ-গামিনীং।
তনুলোমকেশ দশনাং মৃদ্বঙ্গীং মৃদ্বহেস্ত্রিয়ং।
৩অ, ১০ শ্লোক।

যে স্ত্রী অঙ্গহীন নয়, যাহার নাম অতি মৃদু উচ্চারণ করা যায়, হংস মাতঙ্গের ন্যায় যাহার মনোহর গতি, যাহার লোম ও কেশ মৃদুল এবং দন্ত ক্ষুদ্র এমন কোমলাঙ্গী স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক।

কই, সে কন্যা ধর্ম্মসাধনোপযোগিনী হইবে এমত লক্ষণ ত দেওয়া হইল না। সকল লক্ষণই শারীরিক। মানসিক গুণ-ভূষিতা কন্যা যে স্থলে প্রশস্ত, সে স্থলে শারীরিক গুণের কথা কেন? মনুর সুলক্ষণা এবং "হৃদ্যাং ছাদশবার্ষিকীং" কন্যা শারীরিক গুণেই হৃদয়তোষিনী হইতেন। মনুর সময়ে কন্যা যদি দেখিত তাহার ঋতুকাল অতিক্রম হইয়া গেল, তথাপি কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহার বিবাহ দিলেন না তখন কন্যা

নিজেই স্বয়ম্বরা হইতেন। এরূপ বিধানসংহিতায় দৃষ্ট হয়। মনুর কালে অনেক কারণে কন্যার শীঘ্র বিবাহ ঘটিত না। যে স্ত্রীর কেশ পিঙ্গলবর্ণ, যাহার ছয় অঙ্গুলি প্রভৃতি অধিক অঙ্গ, যাহার গাত্রে অতিশয় লোম, যাহার কথা অতি কর্কশ, যাহার নয়ন পিঙ্গল বর্ণ, যাহার নামটা ভাল নয় এরূপ কন্যার বিবাহ হওয়া দুষ্কর হইত। কারণ, এ সকল কন্যা মনুর মতে পরিত্যজ্য। এ সকল কন্যাকে অনেকস্থলেই বোধ হয় যৌবনে বিবাহ করিতে হইত। অথবা তাহারা বয়স্কা হইলে মনুর অষ্টবিধ বিবাহ রীতির মধ্যে কোন অপকৃষ্ট রীত্যনুসারে পাত্র-ন্যস্ত হইয়া পড়িত। সে রূপ ঘটিলে ৩০। ৩৫ বৎসরের পুরুষ যে যুবতী কন্যাকেই বিবাহ করিত, এই রূপই সম্ভাবনা দেখা যায়। এ সকল বিবাহ যে আধ্যাত্মিক উদ্দেশে সংঘটিত হইত, এমত প্রতীতি হয় না। যদি হিন্দু-বিবাহ আধ্যাত্মিক হইত তাহা হইলে সেই উদ্দেশ্যানুযায়ী সমুদায় ব্যবস্থাও হইত, এবং সকল ব্যবস্থার উদ্দেশ্য একই হইত। কিন্তু মনুর সময়ে যে সকল বিবাহ রীতি প্রচলিত ছিল দেখা যায়, তাহাতে যে সেই একই উদ্দেশ্যানুযায়ী বিবাহ কার্য্য সমাধা হইত, সকল ব্যবস্থা পরীক্ষা করিলে এমত অনুমান হয় না। দুই একটী ব্যবস্থা দেখিয়া তত প্রাচীন কালের নীতি উন্নয়ন করা একদেশদর্শিতার কার্য্য। অতএব, মনুসংহিতার সকল দেশ দেখিলে হিন্দু বিবাহকে আধ্যাত্মিক বলা যায় না!

লেখক বলেন সস্ত্রীক না হইলে হিন্দুর ধর্ম্মচর্য্যা হয় না বলিয়া হিন্দুর বিবাহ আধ্যাত্মিক। প্রথমতঃ স্বীকার করিয়া লও যে হিন্দু সস্ত্রীক ধর্ম্মচর্য্যা করিত। তাহা হইলে বলিতে হইবে সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠান হিন্দু জাতিতে যেমন ছিল অপরাপর জাতিতেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টানেরা চর্চ্চে পুরুষ ও স্ত্রী একত্রে বসিয়া উপাসনা করে। আর্য্যা প্রভৃতি স্থলে যে বড় বড় মসজিদ আজিও বিদ্যমান আছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় বেগমদিগের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নিরূপিত ছিল। বাস্তবিক অধীন স্ত্রী জাতিকে যদি ধর্ম্ম কর্ম্মে একত্রে না লওয়া যায়, তবে তাহাদের আর ধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে পারে না। স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি অতি তেজস্বিনী হওয়াতে তাহারা স্বতঃই ধর্ম্মানুষ্ঠানে অগ্রে অগ্রসারিণী হয়, এবং তাহাদিগকে ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃতা রাখাতে পুরুষজাতির স্বার্থসিদ্ধি ও সন্তোষ হয়। এমত স্থলে কোন্ জাতি এমত নির্বোধ হইবে যে তাহাদিগকে ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়োজিত হইতে না দিবে? তাহাদিগকে পুণ্যকর্ম্মে ব্যাপৃত রাখা পুরুষজাতির একটি মহা কৌশল। তাহারা নিজেও তাহাতে ব্যাপৃত হইতে অত্যন্ত ব্যগ্র। সে স্থলে তাহাদিগকে লইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান না করাই মূঢ়তা। অতএব হিন্দুজাতিতে যে বিধান করিবেন, যে পরিণীতা স্ত্রী পতির সহধর্ম্মিণী হইবেন, একথা বড় বিচিত্র নহে। কিন্তু বিচিত্র এই আজিকার দিনে সেই বিধান দেখিয়া একজন বলিয়া উঠিলেন হিন্দুবিবাহ সেই জন্য আধ্যাত্মিক। হিন্দু বিবাহ কেন, সকল জাতিরই বিবাহ তজ্জন্য আধ্যাত্মিক। দ্বিতীয়তঃ দেখা যাউক হিন্দু পত্নী কত দূর

পতির সঙ্গে ধর্ম্মচর্য্যা করিতেন। নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে হিন্দু পত্নী যোগ না দিলে যে তাহা ব্যর্থ হয় এমত নহে। ব্রহ্মচর্য্যে হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠানে স্ত্রীর সংস্পর্শ নাই। স্ত্রী মৃত হইলে গৃহ-শূন্য পুরুষের ধর্ম্মানুষ্ঠান স্ত্রী ব্যতীতও সম্পন্ন হয়। স্ত্রী বিরহে যদি নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মচর্য্যার ব্যাঘাত হইত, তবে রামচন্দ্র সীতাকে মিথ্যাপবাদে বনবাস দিতেন না। অনেক মুনি ঋষিরা স্ত্রী ব্যতীত প্রাত্যাহিক অনুষ্ঠান সকল করিয়া গিয়াছেন। তবে হিন্দু বিধানের মর্ম্ম এই যে, যখন পত্নী বিদ্যমান আছেন, তখন তাহাকে বাম দিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা উচিত নহে। উচিত নহে কে না বলিবে? সীতা বর্ত্তমান থাকাতে এই জন্য রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে সহধর্ম্মিণীর বিদ্যমানতা আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু তাহাও আবার সোণার সীতার প্রতিনিধি দ্বারা চলিয়াছিল। বড় বড় যাগ যজ্ঞে পত্নীকে সঙ্গে করিয়া তদনুষ্ঠানে প্রযুক্ত না হইলে স্ত্রীলোকের আর সে কার্য্যে ফললাভ হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া তাহাকে সঙ্গে লওয়া হইত। আরও দেখিতে পাওয়া যায় স্ত্রী ব্যতীত যেমন নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার বাধা নাই, তদ্রূপ বিধবা স্ত্রীর ধর্ম্মানুষ্ঠান পতি ব্যতিরেকেও অনুষ্ঠিত হইতে পারে। আর যাগ যজ্ঞ কিছু লোকে সচরাচর করিতে পারিত না। বড় বড় রাজাদের ঘরেই প্রায় যাগ যজ্ঞ হইয়া থাকে। তাহাও আবার কদাচিৎ। রামচন্দ্র যখন সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন তখন তাঁহার যজ্ঞানুষ্ঠানের অভিপ্রায় ছিল না বলিয়াই সীতাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। নহিলে সে যজ্ঞানুষ্ঠানের পরও তাঁহাকে বনবাস দিলে চলিতে পারিত। হিন্দু পত্নী পতির ধর্ম্মচর্য্যায় কিরূপ যোগ দিতে পারিতেন দেখুন মনু স্পষ্ট বলিতেছেন:—

নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্ম্মোব্যবস্থিতঃ।
নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োঽনৃতমিতিস্থিতিঃ।
৯অ ১৮।

"যে হেতু স্ত্রীলোকদিগের মন্ত্র দ্বারা জাতকর্ম্মাদি সংস্কার হয় না এজন্য উহাদিগের নির্ম্মল অন্তঃকরণ হয় না এবং বেদ স্মৃতিতে অধিকার নাই এজন্য উহারা ধর্ম্মজ্ঞ হইতে পারে না এবং উহাদিগের কোন মন্ত্রে অধিকার নাই, এজন্য পাপ হইলে মন্ত্র দ্বারা তাহা ক্ষালন করিতে পারে না। অতএব উহারা কেবল মিথ্যা পদার্থ।"

এতদ্দ্বারা হিন্দু-পত্নী কতদূর পতির ধর্ম্মচর্য্যায় যোগ দিতেন তাহা প্রতীয়মান হইতেছে। তবে তিনি যাগ যজ্ঞের সকল গোচ গাচ করিয়া দিতেন, এই রূপই অনুমান হয়। নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মক্রিয়াও হিন্দু-পত্নীর কোন হাত ছিল না। হিন্দুপত্নী তবে কি করিতেন? মনু কহেন:—

অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চহ।
৯অ ২৮।

"অপত্যের উৎপাদন অগ্নিহোত্রাদি যাগ যজ্ঞ এবং আত্ম শুশ্রূষা উত্তম রতি এবং পিতৃগণের ও আত্মার সন্তান দ্বারা স্বর্গলাভ এসকল কার্য্য পত্নী দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়।"

যাঁহার মন্ত্রাদিতে অধিকার ছিল না তিনি যাগ যজ্ঞে যাহা করিতেন তাহা অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে। আর যাগ যজ্ঞ কাহারো

জীবনে ঘটিত কাহারো জীবনে ঘটিত না। তদ্ব্যতীত হিন্দুপত্নী যাহা যাহা করিতেন তাহা উক্ত শ্লোকেই ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি অপত্য উৎপাদন করিতেন। পতির রন্ধনশালা ও ভাণ্ডার তাহার জিম্মা ছিল এবং পতির শুশ্রূষা কার্য্যটা তাহার একচেটিয়া ছিল। তিনি পতির পূজারও গোচগাচ করিয়া দিতেন। অতএব বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইল হিন্দু পতি সন্ত্রীক হইয়া কতদূর ধর্ম্মচর্য্যা করিতেন! সুতরাং হিন্দু বিবাহ আধ্যাত্মিক!

হিন্দু কিজন্য দারপরিগ্রহ করিতেন? না "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"। পুত্র কি জন্য? "পুত্র পিণ্ড প্রয়োজন" লেখকের এ যুক্তি অবলম্বন করিলে এই সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পুত্র জন্মে ততক্ষণ পর্য্যন্ত হিন্দুর বিবাহ করা উচিত। তাহাতে যদি ১০টা মেয়ে বিবাহ করিতে হয় তাও করা উচিত। তিনি নিজেও বলিয়াছেন "পুত্র সন্তান প্রসব না করিলে পতি দারান্তর পরিগ্রহ করিতে পারে"। অথচ তিনি বলিতে চান "কিন্তু পুরুষের বহু বিবাহ যে শাস্ত্র-সম্মত নয় পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বহু বিবাহ বিষয়ক পুস্তকে স্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছেন"। তবেই তিনি আবার বলিতে চান বহু বিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। সে যাহা হউক লেখক কি বলিতে চান মনুর মতে সন্তানোৎপাদন করা একান্ত আবশ্যক? কই, মনু সে কথা বলেন কই? সন্তান থাকিলে যেমন পিতার স্বর্গপ্রাপ্তি হয় তদ্রূপ মাতারও স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। এজন্য মনু বলেন যখন বহু সপত্নীর মধ্যে এক জনের পুত্র হয়, সেই পুত্রকে সকলের পুত্র জ্ঞান করিতে হইবে। অতএব, পুত্র থাকিলে মাতার স্বর্গলাভ হয়। কিন্তু না থাকিলেও যে স্বর্গলাভ হইতে পারে না এমত নহে। সাধ্বী স্ত্রীর সন্তান না থাকিলেও স্বর্গপ্রাপ্তি হয়।

"অনেকানি সহস্রাণি কুমার ব্রহ্মচারিণাং।
দিবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুলসন্ততিং॥
মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ॥
৫ম ১৫৯। ১৬০।

সন্তান না থাকিলেই যে স্বর্গে যায় না এমত নহে, অনেক, ব্রহ্মচারিরা সন্তানোৎপাদন না করিয়াও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা স্বর্গগত হইয়াছেন, তেমনি সাধ্বী স্ত্রীর সন্তান না থাকিলেও স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। সদাচারশালিনী স্ত্রী স্বামীর মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিবেন, তাহাতে তিনি অপুত্রা হইলেও বালখিল্যাদি ব্রহ্মচারিদিগের ন্যায় স্বর্গে গমন করিবেন।" তবেই দাঁড়াইতেছে সংসারাশ্রমে সাধ্বী স্ত্রীর পুত্রোৎপাদন না হইলেও স্বর্গলাভের অন্য উপায় আছে। স্বর্গলাভের পক্ষে পুত্রোৎপাদন একান্ত আবশ্যক নহে।

লেখক নিজ মত বজায় রাখিবার জন্য হিন্দু বিবাহের আধ্যাত্মিকতা কিরূপ যুক্তিতে সমর্থন করিতেছেন দেখুন। তিনি প্রাচীন ব্রাহ্মণ জাতির জীবনোদ্দেশ্য যে আধ্যাত্মিক ছিল তাহা এই কথায় প্রমাণ করিতেছেন, "ফল কথা, হিন্দু শাস্ত্রানুসারে হিন্দুর "জীবন" যে চারিটি আশ্রমে বিভক্ত, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থাশ্রম, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস, সেই চারিটি আশ্রমই মুক্তির পথের চারিটি অগ্র পশ্চাৎ সোপান মাত্র। সেই

চারিটি সোপান পরস্পর সংলগ্ন, তন্মধ্যে কোন একটিকে অপরগুলি হইতে পৃথক করিয়া লইলে মুক্তির পথে বাধা পড়িয়া যায়। জন্মগ্রহণ করিবার পর হইতেই হিন্দুকে মুক্তির পথে প্রবেশ করিতে হয়। সেই জন্য হিন্দু পঠদ্দশায় ব্রহ্মচারী, গৃহস্থাশ্রমেও ব্রহ্মচারী। অতএব হিন্দুর গৃহস্থাশ্রমকে হিন্দুর বানপ্রস্থ হইতে পৃথক করিবার যো নাই। এবং হিন্দুর বানপ্রস্থকে যদি আধ্যাত্মিক কহা যাইতে পারে, তবে হিন্দুর গৃহস্থাশ্রমকেও আধ্যাত্মিক না বলিলে চলে না।" প্রাচীন দ্বিজাতির "জীবনোদ্দেশ্য" কিরূপ আধ্যাত্মিক ছিল তাহা এইরূপ কথায় ব্যক্ত করিয়া লেখক সিদ্ধান্ত করিলেন "তাই বলিতেছি হিন্দু "বিবাহের" উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক" অর্থাৎ হিন্দুর জীবনের উদ্দেশ্য যখন আধ্যাত্মিক, তখন সেই জীবনের প্রতি ক্রিয়াও আধ্যাত্মিক। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া আবার সেই একই নিশ্বাসে বলিতেছেন "মৃত মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত বিদ্যালোচনা আপন জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন এ কথা বলিলে এমন বুঝায় না যে তিনি বিদ্যালোচনা ভিন্ন আর কোন কাজই করেন নাই। আহারও করেন নাই, নিদ্রা যান নাই, সংসার ধর্ম্মও করেন নাই। অথচ বিদ্যালোচনা ছাড়া তিনি আহার বিহার ও সংসার ধর্ম্ম করিয়াছিলেন বলিয়া এমন কথা বলা যায় না যে বিদ্যালোচনা তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল না।" এ কথা গুলির অভিপ্রায় এই অক্ষয়কুমারের জীবনোদ্দেশ্য বিদ্যালোচনা থাকিলেও তাহার জীবনের সকল ক্রিয়াকে কখনই বিদ্যালোচনা বলা যায় না, অথবা সকল ক্রিয়াই যে বিদ্যালোচনার উদ্দেশ্যে গৃহীত হয় এমত নহে। প্রাচীন ব্রাহ্মণের জীবনোদ্দেশ্য মুক্তি হইলেও তাঁহার বাল্যলীলা ও যৌবনের ব্যসন ও ক্রীড়ার উদ্দেশ্যও যে মুক্তি, এমত কথা বলা যায় না। এ যুক্তি অনুসারে কি দাঁড়ায় "হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক"? লেখকের প্রধান যুক্তি এই, যাহার উদ্দেশ্য মুক্তি তাহাকে আধ্যাত্মিক বলা যায়। হিন্দু বিবাহ করে সংসার ধর্ম্ম করিবার জন্য, সংসার ধর্ম্মে কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, কর্ম্ম নহিলে তত্ত্বজ্ঞানে উপনীত হওয়া যায় না, তত্ত্বজ্ঞান নহিলে মুক্তি হয় না; অতএব হিন্দু বিবাহ আধ্যাত্মিক। তাহা হইলে বল না কেন আহার বিহার নহিলে শরীর ধারণ করা যায় না, বাল্য ও যৌবনের ক্রীড়াদি না হইলে শরীরের স্ফূর্ত্তি হয় না। শরীরের স্ফূর্ত্তি না হইলে জীবন রক্ষা হয় না। জীবন রক্ষা না হইলে মুক্তি পথের আশা করা যায় না, অতএব মানুষের বাল্য লীলাদি এবং যৌবনের ব্যসনাদি সকলই আধ্যাত্মিক। মানুষের আহার বিহার ও মলমূত্র ত্যাগ প্রভৃতি সকলই যখন আধ্যাত্মিক, তখন আর কি সপ্রমাণ হইতে বাকি থাকে বিবাহটা আধ্যাত্মিক!

বিবাহকে আধ্যাত্মিক প্রমাণ করিবার জন্য লেখক অনেক স্থলে অনেক কথা জোর করিয়াও বলিয়াছেন। তিনি বলেন "একথা ও বলিতে পারা যায় যে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক অন্য কাহার বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক নয়।" নয় কেন? অন্য জাতীয় লোকের জীবনের উদ্দেশ্য কি মুক্তিলাভ নয়? না

অন্য জাতি সংসার ধর্ম্মও দার পরিগ্রহ করে না? যে যুক্তি অনুসারে লেখক হিন্দু বিবাহকে আধ্যাত্মিক বলিয়াছেন, আমরা দেখিতেছি, সেইযুক্তি অনুসারে অন্য জাতির বিবাহকে আধ্যাত্মিক বলিবার বাধা কিছুই নাই। মুক্তিলাভ করিতে হইলে যেমন হিন্দুর ইন্দ্রিয় সংযমাদি করিতে হয় অপর জাতির পক্ষেও সেই বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হিন্দুরাই একা ইন্দ্রিয় সংযম করেন আর কোন জাতি করেন না, লেখক কি এমত কথা বলিতে পারেন? খ্রীষ্টান মুসলমান সকল জাতিরই জীবনোদ্দেশ্য মুক্তিলাভ এবং সকল জাতিপক্ষে ইন্দ্রিয় সংযমাদির বিধি আছে। তবে এত গর্ব্ব কেন? লেখকের কথা শুনিলে কি অপর জাতির লোক হাস্য সম্বরণ করিয়া থাকিতে পারিবেন?

আর একটি কথাও জোর করিয়া বলা হইয়াছে। তিনি বলেন "গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া হিন্দুকে প্রতিদিন সযত হইয়া দেবপূজা, পিতৃশ্রাদ্ধ, অতিথিসেবা, ভূতপালন (পশু, পক্ষী, কৃমি কীটাদি পালন) প্রভৃতি পাঁচটি মহাযজ্ঞ করিতে হয় এবং সর্ব্বদাই যাগ, যজ্ঞ ব্রত প্রভৃতি কর্ম্ম সম্পাদান করিতে হয়। এই সকল নিত্য ও নৈমত্তিক কর্ম্মে সংযম আবশ্যক, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ আবশ্যক, স্বার্থত্যাগ আবশ্যক, ভোগ স্পৃহা পরিহার আবশ্যক। সংযমাদি ব্যতীত এ সকল কর্ম্ম করা যায় না। "সে কি কথা! আমরাত প্রতিদিন দেখিতেছি অনেকেই এ সকল দৈনিক কার্য্য নিত্য সম্পন্ন করিতেছেন, অথচ তাঁহারা বিলক্ষণ স্বার্থপর, ভোগস্পৃহ, ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ। এক্ষণে এমত অনেক ব্রাহ্মণ দেখা যায় যাহারা দেবপূজা ও শ্রাদ্ধাদি করিতেছেন, অতিথিসেবা ও পশু পক্ষী পালন করিতেছেন এবং সস্ত্রীক তীর্থ ধর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছেন অথচ দিব্য গাড়ী ঘোড়া চড়িয়া,পেটপুরে মদ খাইয়া ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার চূড়ান্ত করিয়া বেড়াইতেছেন।

লেখক আরও বলিয়াছেন "মনু প্রভৃতি শাস্ত্রলেখকেরা বলেন যে গৃহস্থ পঞ্চ মহাযজ্ঞ বা বলিকর্ম্ম শেষ করিয়া যজ্ঞের যে অন্ন অবশিষ্ট থাকিবে তাহা সস্ত্রীক ভোজন করিবে। * * । না করিলে সস্ত্রীক মহাপাপে লিপ্ত হইবে। হিন্দুর নিত্য কর্ম্মে স্বার্থত্যাগ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ভোগস্পৃহা, পরিহার এবং সংযম কত আবশ্যক, তাহা এই একটিমাত্র বিধান দৃষ্টেই বুঝিতে পারা যায়।" কই? আমরা ত পারিলাম না। আমরা নিত্য দেখিতেছি, মধ্যবিত্ত গৃহস্থালয়ে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী নিত্য নিত্য লেখক যাহাকে "মহাযজ্ঞ" বলিয়াছেন, তাহা অনায়াসে নিষ্পন্ন করিয়া সর্ব্বশেষে অন্ন আহারাদি করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে পায়ের উপর পা দিয়া, ভোগের উপর ভোগ করিয়া, ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া জীবন যাপন করিতেছেন। লেখক একথা বলিতে পারেন, করিতেছেন বটে, কিন্তু শাস্ত্রের বিধি ইন্দ্রিয়-সংযম। সে কথা ঠিক, সেরূপ বিধি শুদ্ধ হিন্দুশাস্ত্রের কেন, সকল জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রেরও সেই বিধি। মুক্তিপথের তাহা সাধারণ বিধি। কিন্তু সেরূপ বিধি অন্য জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে থাকাতেও যখন অন্য জাতীয় বিবাহকে আধ্যাত্মিক বলা হইল না, তখন হিন্দু জাতির বিবাহকে বলা হয় কেন? হিন্দু জাতির বিবাহকে যদি আধ্যাত্মিক বল, তবে

বল সকল জাতির বিবাহই আধ্যাত্মিক। বিবাহ মাত্রই আধ্যাত্মিক। বিবাহ কেন, মনুষ্য জীবনের সকল কার্য্যই আধ্যাত্মিক।

এই ওকালতির আর এক কৌশল দেখিলাম। "হিন্দু বিবাহ" শীর্ষক প্রবন্ধ-লেখক নিজ মতের পারিপুষ্টির জন্য বলিয়াছেন, হিন্দু শাস্ত্রকার গণের অভিপ্রায় এই (হিন্দু-শাস্ত্রকারগণের ভাণ করিবার প্রয়োজন কি?) হিন্দু নারী পরিণীতা হইয়াই পতির সঙ্গে এক হইয়া যায়। এই একত্ব খণ্ডনার্থ বিপক্ষবাদিগণ হিন্দু শাস্ত্রের অবিবেদনের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। অমনি উকিল মহাশয় একটি আশ্চর্য্য কৌশল বাহির করিলেন। তিনি নিজ মতের সমর্থনার্থ একটি গল্প ফাঁদিলেন। এক মতের পোষনার্থ আর এক মতের সৃষ্টি করিলেন। সে মতটি আমরা লেখকেরই কথায় বলিব। লেখক একটি উপকথার উত্তাবন করিয়া শেষে সিদ্ধান্ত করিলেন। "মোট কথা, বৃহৎ ও বহু প্রাচীন সমাজে অনেক রকম লোকাচার থাকে। সে সকল লোকাচারের মধ্যে সকল গুলিই যে শাস্ত্রানুমোদিত হয় তা নয় কিন্তু শাস্ত্রানুমোদিত না হইলেও সে গুলি শীঘ্র লোপ হয় না। এবং হিন্দু শাস্ত্রকারেরাও বিশিষ্ট কারণে লোকাচারের প্রতি কিঞ্চিৎ আস্থাবান বলিয়া শীঘ্র রহিত করিতে ইচ্ছুক নহেন।" দেখুন একবার কল্পনার দৌড় দেখুন। লেখক এই বর্ত্তমান কালে হুজুকে কলিকাতা সহরে বসিয়া হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন আর্য্যবর্ত্তে কিরূপ ঘটিয়া ছিল, তাহার একবার ঠিক ইতিহাস দিলেন! একটি মতের Hypothesis সৃষ্টি করিয়া আর একটি মত hypothesis বজায় করিলেন। এই যুক্তি অনুসারেই কি বলা যায় না, বাল্য-বিবাহটা তজ্জন্য রহিত হয় নাই?

ওকালতি করার দোষ এই যখন যে কথার পোষকতা করিতেছি, তখন তাহাই মাত্র ভাবিতেছি, অন্য সকল কথায় অন্ধ হইতে হয়। এক কথা বলিতে গিয়া অন্যদিকে যে গলদ্ হয়, সেই সকল ছিদ্র দেখিয়া বিচার কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। নহিলে দুই পক্ষের ওকালতি যদি অগওনীয় হইত, তাহা হইলে বিচারক আর মীমাংসা করিতে পারিতেন না। "হিন্দু বিবাহের" প্রস্তাব যে কেবল ওকালতি মাত্র তাহার আর একটি প্রমাণ এই, তাহাতে এককথা প্রমাণ করিতে গিয়া লেখক অন্য কথার ছিদ্র দিয়া গিয়াছেন। তিনি বহুবিবাহের পূর্ব্বোক্ত নবীনমত বাহির করিতে করিতে বলিলেন "শাস্ত্রানুসারে কেবল কতগুলি নির্দ্দিষ্ট কারণে পুরুষ ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিতে সমর্থ। অর্থাৎ স্ত্রী চিররুগ্না হইলে এবং পুত্র সন্তান প্রসব না করিলে পতি দারান্তর পরিগ্রহ করিতে পারে।" কতকগুলি কারণের মধ্যে লেখক কেবল দুইটি কারণ দিয়াছেন। অপর গুলি চাপা রহিল। মনু অন্যান্য যে যে কারণেও অধিবেদনের বিধি দিয়াছেন আমরা তাহা বলিয়া দিতেছি:—

স্ত্রী অপ্রিয় ভাষিণী হইলে তৎক্ষণাৎ অধিবেদন করিবে। পতি-পুত্র-তাড়ন-কারিণী, হিংস্রক অর্থের নাশকারিণী এই রূপ স্ত্রী থাকিতে ভর্ত্তা দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিবেক।"

মনু ৯অ, ৮০। ৮১

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, চিররুগ্না বলিয়া পত্নী ত্যাগ করিলে বিবাহের আধ্যাত্মিকতা প্রমাণিত হয় কই? অন্যান্য কারণ গুলি ধরিয়াও যদি পত্নীত্যাগ করা যায়, তবে আর বিবাহের আধ্যাত্মিকতা রহিল কই? যদি পুত্রোৎপাদন করিতে পারিলেই আধ্যাত্মিকতা বজায় থাকে তবে কি দোষে কানা খোঁড়া, চিররুগ্না এবং যে স্ত্রীর মস্তকের কেশ পিঙ্গলবর্ণ, যাহার ছয় অঙ্গুলি প্রভৃতি অধিক অঙ্গ, যাহার গাত্রে অতিশয় লোম, যে নিষ্ঠুর ভাষিণী, নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, ম্লেচ্ছ পর্ব্বত, পক্ষী, সর্প ও দাস ইহাদিগের নামে যে স্ত্রীর নাম, তাহাদিগকে বাদ দিয়া বিবাহ করা উচিত হয়?

নোদ্বহেৎ কাপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন
রোগিনীং।
নালোমিকাং নাতি লোমাং ন বাচাটাং ন
পিঙ্গলাং।

মনু ৩অ, ৮শ্লোক।

ইহারা কি পুত্রোৎপাদন করিতে পারে না? না ইহাদের দ্বারা সহধর্ম্মিণীর কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না? ইহাদিগকে গ্রহণ করিলে কি মোক্ষ হয় না? যিনি ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিবেন, তিনি পত্নীর কায়িক অবস্থার দিকে দেখিবেন কেন? যত দিন সংসার ধর্ম্মে থাকা যায় ততদিনই ত পত্নীর সঙ্গে সম্পর্ক। বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলে ত আর পত্নীর সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না। তবে এত বাছিয়া বাছিয়া বিবাহ করার দরকার কি? আবার দেখুন যিনি পতির সহিত এক-শরীর হইয়া গিয়াছেন, দ্বিতীয় বার দার-পরিগ্রহ করিয়া তাহাকে পৃথক্ করিয়া দেওয়া হয় কেন? দশজনকে বিবাহ করিলে যদি দশ জনই পতির সঙ্গে এক-শরীর হইয়া যান, তবে আর একীকরণের মর্য্যাদা থাকে কি? যখন পঞ্চীকরণ, ষড়ীকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুমোদিত, অনুমোদিত কেন, মোক্ষের জন্য আবশ্যক, তখন আর একীকরণ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হয় কই? বহু বিবাহ শুধু শাস্ত্রানুমোদিত নহে, পুত্রের জন্য আবশ্যক। যখন বহু বিবাহ শাস্ত্রে রহিয়াছে তখন আর কি রূপে বলিব, একীকরণ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য? শাস্ত্রের উদ্দেশ্য একীকরণ হইয়া আবার পঞ্চীকরণ, ষড়ীকরণ ও হইতে পারে না।

বহু বিবাহ শাস্ত্র মধ্যে বিদ্যমান থাকাতেই লেখকের একীকরণের মত (Hypothesis) বিনষ্ট হইতেছে। তদ্দ্বারা আর একটি মত (Hypothesis) বিনষ্ট হয়। লেখক বলেন হিন্দু বিবাহ চুক্তি নহে। হিন্দু বিবাহ যাবৎ জীবনের জন্য। যাবৎ জীবন কেবল স্ত্রীই বাঁধা থাকেন, পতি বাঁধা থাকেন কই! পতি পঞ্চাশটা বিবাহ করিয়া প্রথম পত্নীতে আর এক-শরীর হইয়া রহিলেন না। পত্নীই এক শরীর হইবে, পতি এক শরীর হইবে না, এ কিরূপ এক-শরীর হওয়া হইল! হিন্দু বিবাহ ও কি চুক্তি নহে? যদি পতির ঠিক মনোমত না হইল, তবে পত্নী পরিত্যক্তা হইয়া চিরকাল থাকিলেন। পরিত্যক্তা পত্নী জীবিত থাকেন মাত্র, তাহার পত্নীত্ব সব যায়। পতির ইচ্ছাকাল পর্য্যন্ত কি দাম্পত্য সহবাস নির্দ্দিষ্ট নহে? পরিত্যক্তা পত্নীর খোর-পোষ বন্দোবস্ত আছে বটে, কিন্তু খোর-পোষাই কি পত্নীত্ব। জীবিকা

বিধান হইলেই কি পত্নীত্ব হয়? জীবিকাবিধান হইলেই কি পতিতে বাঁধা থাকা হইল! ইউরোপীয়গণের "Divorce" ডাইভোর্সের পর আবার বিবাহ হইতে পারে, ইহা সামাজিক ব্যবস্থা। কিন্তু হিন্দু পত্নীর সধবা অবস্থায় আর বিবাহ হইবার ব্যবস্থা নাই বলিয়া তাহার খোর-পোষের বিধান আছে। উহা কেবল জীবিকার ব্যবস্থা মাত্র। নহিলে হিন্দুবিবাহে ও কি এক রকমে Divorce নাই! যদি তাই হয়, তবে হিন্দু বিবাহ কি চুক্তির বিবাহ নহে? যতদিন পতি পত্নীর বনিবনাও হয়, ততদিনই একশরীর হইবার চুক্তি থাকে।

আর এক স্থলে ওকলাতির ছটা দেখুন। লেখক নিজ মত বজায় করিবার জন্য এক স্থানে শারীরবিজ্ঞানকে জাহান্নমে দিতেছেন। তিনি বলেন "এইরূপ ছোট কথা বল, বড় কথা বল, বিজ্ঞানে কোন কথারইত একটা মীমাংসা দেখিতে পাওয়া যায় না, সকল কথাতেই ত theory, hypothesis, * মতের মারামারি ঠেঙ্গা ঠেঙ্গি দেখিতে পাই।" এইরূপে শারীর বিজ্ঞানকে একেবারে অপদস্থ করিয়া দিয়া লেখক আর এক স্থলে বলিতেছেন—"শারীর বিজ্ঞান স্ত্রী-গমন সন্তানোৎপাদন প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়া সম্বন্ধে যাহা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রমাণ করিয়া দিবে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপায়েই তাহা পালন করা সম্ভব ও কর্ত্তব্য। শারীর বিজ্ঞান মানিতেই হইবে। কিন্তু শারীর বিজ্ঞানকে সমাজ, নীতি ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের অধীন না করিলে শারীর বিজ্ঞান একেবারে নিরর্থক হইবে।" এ কথা আবার কেন, এই হল, শারীর বিজ্ঞানের কোন কথারই ঠিক নাই; তাহাতে কোন মীমাংসা নাই; আবার শারীর বিজ্ঞানকে মানিতে হইবে! শারীর বিজ্ঞানের মীমাংসা সমুদায় স্ত্রী-গমন ও সন্তানোৎপাদন প্রভৃতি ক্রিয়া সম্বন্ধে গ্রাহ্য করিতে হইবে! যাহার মীমাংসাই নাই, তাহার আবার মীমাংসা লইতে হইবে কিরূপে? শারীর বিজ্ঞানের মীমাংসা নাই বটে, কিন্তু অধ্যাত্ম শাস্ত্র আবার মীমাংসায় পরিপূর্ণ। মনু যে উক্ত দ্বিবিধ বিষয়ক বিধিতে পরিপূর্ণ! যে অধ্যাত্ম শাস্ত্র সকল মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছে, সে আবার অন্যের নিকট মীমাংসা ধার করিতে যাইবে কেন? লেখকের অধ্যাত্ম শাস্ত্রে এত সূক্ষ্ম-দৃষ্টি যে, পত্নীকে পরকালে কোথায় গমন করিতে হইবে তাহাও পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া দিয়াছেন। তখন আর সে অধ্যাত্ম শাস্ত্র মীমাংসার কি বাকি রাখিয়াছে? তাঁহার অধ্যাত্ম শাস্ত্র পরকাল দেখে, বিপক্ষগণের শারীর বিজ্ঞান কেবল ইহকাল দেখে। তবে আর শারীর বিজ্ঞানের সহিত অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের মিলন হয় কই? বিপক্ষগণের শারীর বিজ্ঞানকে যদি লেখকের অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের অধীন হইতে হয়, তবে ত সে শারীর বিজ্ঞানকে একে বারে দেশ ছাড়া হইতে হয়।

লেখকের অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি দেখুন। "মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা বলিয়া

* যেন লেখক theory ছাড়া, আর তিনি যাহাকে অধ্যাত্ম বিজ্ঞান কহেন তাহা ও theory ছাড়া। theoryর percentage শারীর বিজ্ঞানে বেশী, না অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে বেশী?

থাকেন যে, যে স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে স্বামীর অনুগামিনী হন, তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া সেই স্বামী লোকেই গমন করেন। কর্ম্মফল-বাদ বিবাহের পারলৌকিকত্ব নাশ করে না, দৃঢ় করে। বিবাহের পারলৌকিকত্ব কর্ম্মফল বাদের অবশ্যম্ভাবী ফল।"

এই কয় ছত্রে লেখক বোধ হয় বলিতে চান যে পত্নী যে শুদ্ধ ইহলোকে পতির সহিত এক হইয়া গিয়াছেন এমত নহে, তিনি সেই একত্ব পরলোকে গিয়াও রক্ষা করেন। পরলোকেও তিনি পতির সঙ্গে এক হইয়া থাকেন। তিনি বলিতেছেন "বিবাহের যে একীকরণ উদ্দেশ্য, পতি পত্নীর যদি যথার্থই সেই একীকরণ হয়, অর্থাৎ পতি পত্নীর যদি এক ধ্যান, এক জ্ঞান, একরুচি, এক প্রবৃত্তি, এক কর্ম্ম, এক ধর্ম্ম হয়, তবে ত কর্ম্মফল-বাদানুসারেই তাহারা পরলোকে এক ফল প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ পতি পত্নী রূপেই থাকিবে।" এ কথা বড় সহজ কথা নয়। লেখকের অধ্যাত্ম শাস্ত্র পরকাল ভেদ করিয়া কোথায় কে যাইবে তাহা ঠিক করিয়া দিয়াছে। যত দোষ শাস্ত্রীর বিজ্ঞানের বেলা!

লেখক বলেন, হিন্দু বিবাহ এই জন্য আধ্যাত্মিক, যে মোক্ষ ইহার দূর লক্ষ্য। ব্রহ্মচর্য্যের পর সংসার ধর্ম্ম, কিন্তু সংসার যখন অন্য দ্বিবিধ আশ্রমের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চালিত হয় এবং সেই উদ্দেশ্য যখন মোক্ষ তখন কেন না বলিব দারপরিগ্রহের উদ্দেশ্য মোক্ষ। বেশ কথা, কিন্তু সংসার ধর্ম্ম কত দিন? বানপ্রস্থে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কি সংসার ত্যাগ করিতে হয় না? যদি হয়, পত্নী কি বিরাগী বনবাসীর অনুগামিনী হইয়া সঙ্গে থাকেন? না, পত্নী সেই বানপ্রস্থাবলম্বী পতির সহিত এক ধ্যান এক জ্ঞান এক ধর্ম্ম ও এক কর্ম্ম হইয়া থাকেন? যাঁহার মন্ত্রে অধিকার নাই, যাহার বেদে অধিকার নাই, তিনি কিরূপে বেদজ্ঞ ও তপ-জপ-পরায়ণ ব্যক্তির সহিত এক ধ্যান এক জ্ঞান হইবেন? তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কি অনেক পার্থক্য থাকিবে না। পতির উদ্দেশ্য মোক্ষ। মোক্ষ লাভ হইলে তাহার আত্মা পরমাত্মায় লয় হইবে। তখন পত্নী কোথায়? পত্নীও কি পতির সহিত লয় প্রাপ্ত হইবেন? তবে ত তিনি তত্ত্বজ্ঞানলাভ না করিয়া এবং সন্ন্যাস প্রবেশ না করিয়াও মোক্ষ লাভ করিলেন? পত্নীর মোক্ষ কি এত সস্তা? কিন্তু মনে করুন পতির নির্ব্বাণ মুক্তি হইল না। তাহা হইলেও কি পত্নীর ধর্ম্ম ঠিক পতির ধর্ম্মের সহিত একই প্রকার হয়? কিছু ইতর বিশেষ নাই? যদি ইতর বিশেষ থাকে তবে ত এক লোকেই গমন হইল না। যখন এক লোকে গমন হইল না তখন উভয়েই যে আবার এক হইয়া থাকিবে এমত সম্ভাবনা কি? তা যদি না হয়, তবে আর পতি পত্নীর একত্ব রহিল কই? তাহা তো ইহলোকেই পর্য্যবসিত হইতেছে। ইহলোকেও আবার কত দিন? যত দিন পতি সংসার আশ্রমে অবস্থান করেন। যে স্থলে পঞ্চপত্নীই সাধ্বী ও পতি অনুগামিনী সেস্থলে সেই পাঁচ জন স্ত্রীই কি পতির জন্ম জন্মান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইবে? যদি না বেড়ায় তবে তাহাদের একীকরণ

হয় কই? আর যাহার এক বার পাঁচটা বিবাহ হইল, তাহার ত বরাবর পাঁচটা থাকিয়া যাইবে; কারণ পাঁচটাই একীকৃত হইয়া গিয়াছে। যদি না হয়, তবে বল একীকরণ হয় না। একের একীকরণ না হইলে কাহারও একীকরণ সম্ভাবিত নহে। কারণ যে জন্য একজন পৃথক্ হইতে পারে সেই কারণে সকলেই পৃথক্ হইতে পারে। আবার দেখুন পত্নী যদি পতির অনুগামিনী হইয়া পরলোকে জন্ম লাভ করিয়া থাকে, তবে ত তাহাদের বিবাহ ও মিলন অনিবার্য্য। তাহাদের বিবাহ হইলে পত্নীর আর শিক্ষার কি প্রয়োজন? সে পত্নী ঠিক পতির অনুরূপ হইয়া জন্ম লাভ করিয়াছে। কারণ, পূর্ব্বজন্মে তাহাদের এক ধ্যান, এক-জ্ঞান হইয়াছিল। যদি শিক্ষার প্রয়োজন না হয়, তবে বালিকা-বিবাহের প্রয়োজন কোথায়? লেখকের মতানুসারে যখন সকল বালিকাকে পতির মত গড়িয়া লইতে হইবে, তখন তাহাদের মধ্যে কাহারই পূর্ব্ব জন্মের একত্ব ছিল না, এই কথাই প্রমাণিত হয়। ইহজন্ম যদি পূর্ব্ব জন্মের পরলোক হয়, এবং পরলোকে একত্ব সহবাস ও এক-শরীর হইয়া গেলে যদি পূর্ব্ব জন্মের ধ্যান, জ্ঞান, ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল এক হয়, তবে আর ইহলোকে শিক্ষার প্রয়োজন আদৌ দেখা যায় না। শিক্ষার প্রয়োজন না হইলে লেখকের যুক্তি অনুসারে বালিকা-বিবাহেরও প্রয়োজন নাই।

আমরা ওকালতির আর একটি দৃষ্টান্ত দিব। "হিন্দু বিবাহ" নামক প্রস্তাবে লেখক সুবিধামত এত শাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন, যে তাহাকে ওকালতি বলিব না ত কি? তিনি কেবল বালিকা-বিবাহের বেলা শাস্ত্র-বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। দেখাইয়াছেন কন্যাবিবাহ অল্প বয়সে হওয়া উচিত এবং পাত্র-নির্ব্বাচনের ভার কর্ত্তৃপক্ষের হাতে থাকা উচিত। বেশ কথা, কিন্তু কন্যানির্ব্বাচন কার্য্যও যে কর্ত্তৃশক্ষীয়গণের হাতে থাকিবে এবং পাত্রের বিবাহ যে অল্প বয়সে হইবে, একথার শাস্ত্রীয় পোষকতা কই? কেবল অবলাকন্যা-বিবাহ কালীন শাস্ত্র কথা; আর ছেলের বিবাহ-বেলায় চুপ। ছেলের বিবাহ-বেলায় মুক্তি আসিল, তখন আর শাস্ত্রে হালে পানি পায়না। তার বেলা লেখক ইউরোপীয় নির্ব্বাচন প্রথা লইয়া পড়িলেন। অথরিটি Authority এবং পোষকতাও মাতব্বর—অমৃত বাবুর পত্র। আমাদের খৃষ্টান ভায়া দয়া করিয়া যে ইংরাজী সাক্ষী দিয়াছেন, তাহাতে একদেশদর্শিতাই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি দুই এক জনের কথা তুলিয়া দেখাইলেন ইউরোপে নির্ব্বাচন-প্রণালীর জন্য অনেক বিবাহের ফল অসন্তোষকর হয়। কিন্তু হিন্দু মণ্ডলীর বিবাহের ফল যে কতদূর অসন্তুষজনক, এবং সেই অসন্তুষকর বিবহের সংখ্যা যে কত অধিক, তাহার কি তিনি বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, না দিতে পারিয়াছেন? হিন্দু সমাজ মধ্যে যে কত পত্নী ত্যজ্য হইয়া ঠেলা আছে তাহার কি ইয়ত্তা হয়? যদি হিন্দু সমাজের ঠেলা দাসীদিগের গণনা করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইত এবং যদি তিনি তাহা করিয়া তুলনায় দেখাইতে পারিতেন যে 'হিন্দুবিবাহের ফল অধিকতর সন্তোষকর তবে না তাঁহার কথা গ্রাহ্য হইতে পারিত।

নহিলে শুধু ইংরাজী সমাজের সাক্ষ্য দিলে কি হইবে? সে যাহা হউক, এখন শাস্ত্রীয় কথা গ্রহণ করা যাউক। "হিন্দুবিবাহ" প্রস্তাব-লেখক কি সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র আলোড়ন করিয়া দেখাইতে পারেন যে হিন্দু পাত্রের বিবাহ তাঁহার কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ দিবেন? আমরা ত জানি হিন্দু শাস্ত্রের কোন খানে এ কথা নাই। তবে কেন, কন্যা-নির্ব্বাচনের ভার কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের হাতে থাকা তিনি বিধেয় বলিয়াছেন। শাস্ত্র চাও, কন্যা-নির্ব্বাচন কার্য্য কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের হাতে দিতে মানা কর। সে কথা বলিলেই ত প্রতুল; তাহা হইলে ত আর বর্ত্তমান বিবাহ-প্রণালী সমর্থিত হয় না। ছেলের বিবাহ দেওয়া যদি কর্ত্তৃপক্ষগণের হাত থেকে যায় তবে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে মেয়ের বিবাহ দেওয়া আরও কঠিন হইয়া পড়ে। যাঁহার ছেলেমেয়ে পাঁচটি, তিনি ঢাল-সোমর করিয়া ছেলের বিবাহের পাওয়ানায় মেয়ের বিবাহ-ব্যয় সংকুলান করিতেছেন। কিন্তু ছেলের বিবাহটা হাত থেকে গেলে, সে রূপে মেয়ের বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহ করা আর ঘটিয়া উঠিবে না। অথচ শাস্ত্রানুসারে আমাকে মেয়ের বিবাহটা তাড়াতাড়ি দিতেই হইবে। তবে সমাজ চলে কই? এই জন্য লেখক কন্যা-নির্ব্বাচনের বেলা কোন শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই, তার বেলা একদেশদর্শীর মত যুক্তি আনিলেন। তবেই তো হচ্চে, শাস্ত্রের কথা আমরা সমুদয় লইতে পারি কই? এখন সে দেশ কাল পাত্র নাই। আমরা এখন শাস্ত্র ধরিয়া চলি না। দেশাচার আমাদের সর্ব্বস্ব। দেশাচার আমাদের গুরু ও সমাজের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। যে শাস্ত্র-বিধি দেশাচার-বিরুদ্ধ হয়, সে শাস্ত্র-বিধি কি আমরা মানিতে পারি? তবে এত শাস্ত্র লইয়া হুলস্থুল পড়িয়াছে কেন? যিনি অপ্রচলিত শাস্ত্রের বিরুদ্ধে কথা কহিবেন, তাঁহর উপর কটূক্তি বর্ষণ কেন? আমরা কি শাস্ত্র মানি, না দেশাচার মানি? আমাদের কাছে মনুই বা কি, যাজ্ঞবল্কই বা কি, আর অপরাপর স্মৃতিকারই বা কি? মনুর পর যে এত জন স্মৃতিকার হইয়াছেন, ইহাঁরা কি পরবর্ত্তী কালের সমাজনীতির পরিবর্ত্তনকে বিধিবদ্ধ করিয়া যান নাই? বিবাহ সম্বন্ধে মনুর নীতি যে গ্রহণীয় নহে, এই স্মৃতিকারেরা কি তাহাই প্রমাণ করেন না? মনু ক্রমে রদি হইয়া রঘুনন্দনের স্মৃতিবিধানে সঙ্কুচিত হইয়া গেলেন কেন? তাই জন্য বলি শাস্ত্রের সঙ্গে আমাদের তত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নাই। দেশাচারের সমর্থনার্থ শাস্ত্র। শাস্ত্র সমর্থনার্থ দেশাচার নহে। শাস্ত্রকারেরা সবই সমান, সবাই ভক্তিভাজন, কিন্তু দেশাচার শাস্ত্র অপেক্ষা গরীয়ান্। দেশাচারই যে ধর্ম্মনীতি, একথাও শাস্ত্রীয় কথা।

মেয়ের বিবাহ বেলাই বিবাহ আধ্যাত্মিক। সেই আধ্যাত্মিক বিবাহের নিয়মানুসারে ছেলের বিবাহও হওয়াত উচিত। তাহা হইলে ছেলেকে এখনকার ব্রহ্মচর্য্য শেষ করিয়া, অর্থাৎ বি,এ, এম, এ পাশ করিয়া আপনার মনোমত কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে হয়। এরূপ না করিলে আধ্যাত্মিক বিবাহের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। আমার ধর্ম্মসাধনোদ্দেশে যে

কার্য্য করিতে হইবে, সে কার্য্যের ভার অন্যের হাতে কেন? অন্যে আমার ধর্ম্মোপযোগিতা কি বুঝিবে? অন্যদ্বারাই বা আমার ধর্ম্মকার্য্য ভালরূপে সুসম্পন্ন হইবে কিরূপে? আমার ধর্ম্মকর্ম্ম আমি যেমন বুঝি, অন্যে কি তেমন বুঝিতে পারেন? লেখকের মতে বিবাহ যদি আধ্যাত্মিক হয় তবে ত পতির হাতেই কন্যা-নির্ব্বাচন-ভার থাকা উচিত হইয়া পড়ে। কিন্তু লেখক বিবাহকে ও আধ্যাত্মিক বলিবেন, অথচ বর্ত্তমান প্রথার মত কর্ত্তৃপক্ষগণের হাতে কন্যা-নির্ব্বাচনের ভারও দিবেন; এ কেমন কথা! আবার দেখুন আমাকে ধর্ম্মোদ্দেশে যদি পত্নীকে শিক্ষা দিতে হয়, তবে যত শৈশবাবস্থায় সেই শিক্ষা আরব্ধ করা যায় ততই ত ভাল। তাহা হইলে ত আমাকে দুগ্ধপোষ্য কন্যাকে গৃহে আনিতে হয়। তিন চারি বৎসরের কন্যাকে গৃহে রাখিয়া আমার নিজ হাতে তাহার তরিবদ হইলে তবে তাহার তরিবদ ও শিক্ষা ঠিক আমার উদ্দেশ্যানুযায়ী হইতে পারে। তবে কেন প্রস্তাব-লেখক কন্যা কালের বয়স বৃদ্ধি করিয়া দিয়া বর্ত্তমান কালীন কন্যা কালের সমান করিয়া দিয়াছেন। শাস্ত্রে বলে ৮। ৯ বৎসরের কন্যাই বিবাহের পক্ষে উপযুক্ত, কিন্তু শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য হইলে তদপেক্ষা বয়স কমানই যুক্তিযুক্ত বোধ হয়। শ্বশুরালয় যদি কন্যার পাঠশালা হইত, আর পতিকে যদি গুরুমহাশয়গিরি করিতে হইবে, এইরূপ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে যে তরুণ বয়সে ছেলেরা পাঠশালায় প্রবেশ করে, সেই বয়সই কন্যার বিবাহ কাল বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইত। বেশী বয়সে শিক্ষারম্ভ করিলে শিক্ষা ভাল হয় না এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। ১২। ১৩ বৎসর পিত্রালয়ে থাকিলে কি তারপর কন্যার মেজাজ ও স্বভাব চরিত্র আর পরিবর্ত্তিত করা যায়? সে মেয়ে যে বিগ্‌ড়াইয়া যায়। শাস্ত্রে যখন ১০। ১২ বৎসর পর্য্যন্ত কন্যা-কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, যখন ঋতুকালের পূর্ব্বে বিবাহ প্রশস্ত হইয়াছে, তখন শাস্ত্রের তাৎপর্য্য কন্যার শিক্ষা-বিধান নহে, কিন্তু অন্য কিছু আছে, যাহা লেখক গ্রহণ করিতে পারেন নাই। লেখক হিন্দু বিবাহকে যত আধ্যাত্মিক ভাবিয়াছেন শাস্ত্র যদি তত ভাবিত, তাহা হইলে শাস্ত্রে বোধ হয় কন্যাকাল ৩। ৪ বৎসরের অধিক নিরূপিত হইত না। কিন্তু যখন তাহা হয় নাই, তখন শাস্ত্রীয় তাৎপর্য্য যে লেখক সম্যক্ রূপে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন এমত অনুমান হয় না।

কিন্তু মনে করুন, সে কালে বিবাহ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যে, যেরূপ উদ্দেশ্যে লেখক অনুমান করেন, সেইরূপ উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হইত, তাহা হইলে সে কথা আজিকার দিনে কেন? সে ত্রেতাযুগের কথা কলিযুগে কেন? কলিযুগের জন্য যে শাস্ত্রকারেরাও বিভিন্ন বিধান প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং আজি যদি হিন্দু রাজত্ব থাকিত ও হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বর্ত্তমান থাকিতেন, তাহা হইলে যে সমাজের অভ্রান্ত নিয়মানুসারে এক্ষণে নূতন নূতন কালোপযোগী বিধান-শাস্ত্রের ব্যবস্থা হইত তাহার আর সন্দেহ নাই। যে নিয়মে বিভিন্ন কালধর্ম্মে বিভিন্ন স্মৃতিকার জন্মিয়াছিলেন,

আজি সেই নিয়মে বর্ত্তমান কালোপযোগী আর একজন রঘুনন্দন দেখা দিতেন। তবে এখন সে চারি হাজার বৎসরের পুর্ব্বের কথা আনা কেন? চারি হাজার বৎসর পুর্ব্বে হিন্দুসমাজ যেরূপে পাতা ছিল, হিন্দু-সমাজের যেরূপ গঠন ছিল আজি কি সেরূপ আছে? না আর সেরূপ হইতে পারে? তখন যেরূপ সমাজ পাতা ছিল, তাহাতে মোক্ষলাভের পন্থা অতি সুসাধ্য হইয়াছিল। তখনকার আশ্রমিক নিয়ম অনুবর্ত্তন করিলে লোকে সহজে মোক্ষলাভে সমর্থ হইতেন। এখন কিছুতেই সে সমাজ-সংস্থান ঘটিতে পারে না। হিন্দু রাজত্ব থাকিলেও তাহা ঘটিত না। কারণ হিন্দু রাজত্ব কালেই সে সমাজের ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া আসিয়াছে। যে কালে চারি আশ্রমের নিয়ম ছিল, সেই কালে যদি বিবাহ আধ্যাত্মিক হইয়া থাকে, তবে যখন সেই আশ্রম চতুষ্টয় লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন আর বিবাহ আধ্যাত্মিক হইতে পারে না। অতএব বিবাহের আধ্যাত্মিকতা লেখকের যুক্তি অনুসারেই অনেক কাল পুর্ব্বে উড়িয়া গিয়াছে। হিন্দুসমাজে বিবাহের উদ্দেশ্য অন্যবিধ হইয়াছে। সেই উদ্দেশ্যানুযায়ী এক্ষণকার বিবাহরীতি প্রচলিত আছে। সুতরাং পূর্ব্বকার উদ্দেশ্য ধরিয়া এক্ষণকার হিন্দু বিবাহ সমর্থিত হইতে পারে না। যে আধ্যাত্মিকতা পূর্ব্বের উপযোগী ছিল, এক্ষণে তাহার সে উপযোগিতাও নাই। এক্ষণে সে মৃত আত্মার প্রেতকে আহ্বান করা নিষ্প্রয়োজন। যাহা মৃত হইয়াছে, তাহা প্রেত ভূমিতে মিশাইয়া রাখ।

যে মোক্ষ ধরিয়া হিন্দুবিবাহকে আধ্যাত্মিক বলা হইয়াছে, সেই মোক্ষ কিরূপ লেখক তাহা ভাল রূপে ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন "মুক্তিলাভের অর্থ আনন্দময় আত্মার স্বরূপ দর্শন"। আত্মার স্বরূপ-দর্শন মোক্ষের সাধন মাত্র তাহা মোক্ষ নহে। আমরা জানি কর্ম্ম ফলহেতু স্বরূপ সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করাই মোক্ষ। সে মোক্ষ কিরূপে লাভ হইতে পারে? না আত্মজ্ঞানে, বা আত্মদর্শনে অথবা পরমাত্মাতে আত্মার লয় হইলে জীব সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষলাভ করেন। মনুর দ্বাদশ অধ্যায়ের ৮৪ হইতে ৯০ শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিলে মুক্তির অর্থ এই রূপই দাঁড়ায়। সে যাহা হউক, লেখক যে মোক্ষ ধরিয়া আধ্যাত্মিকতার মহা হৈ চৈ তুলিয়াছেন, লোকে আগে সেই মোক্ষের প্রার্থী হউক, তখন তাহাকে সে দিকে যাইতে বলিবে। যদি এক্ষণকার লোকে সে মোক্ষই না চায়, তবে আর তাহার কাছে আধ্যাত্মিকতার জারি করা কেন? নিবৃত্তি-মূলক মোক্ষ প্রবৃত্তিপথানুগামী সংসারীর পক্ষে উপযোগী নয়। যাহারা চিরকাল সংসারে আছে ও সংসারে থাকিবে যাহারা কখন প্রবৃত্তি-পথ পরিত্যাগ করিবে না, এক্ষণে কেমন একটা ধূয়া উঠিয়াছে, তাহাদের নিকট কেবল নিবৃত্তি পথের কথা। যে পথে তাহারা আছে ও থাকিবে সে পথের শ্রেয়োলাভের কথা কেহ কহে না। এরূপ করিয়া মূর্খ লোকদিগকে কেবল ধাঁধাঁ দেওয়া হয়। এইরূপ ধূয়া ধরিয়া আজি আধ্যাত্মিক বিবাহের কথা উত্থাপিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে প্রবৃত্তি-পথ নিবৃত্তি পথের অনুগামী ছিল। তখন নিবৃত্তিই প্রধান, প্রবৃত্তি তাহার অনুগামিনী ছিল। ক্রমশঃ এই নিবৃত্তিপথ অপ্রবল হইয়া এক্ষণে একমাত্র প্রবৃত্তি পথই প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং সে কালের প্রবৃত্তি-পথের মোক্ষ এক্ষণকার প্রবৃত্তি-পথের অভিলষিত হইতে পারে না।

ছোট ছোট বউ ঘরে আনিলেই পরিবার মণ্ডল আধ্যাত্মিক হইয়া যায় না। সে কালের সমাজ-গঠন চাই, সে কালের শিক্ষা চাই। যখন সেকালের সমাজ-গঠন নাই, আর সেকালের শিক্ষাও তরিবদ হওয়া যখন অসম্ভব, তখন বর্ত্তমান সমাজে আধ্যাত্মিকতার দাঁড়াইবার স্থল কই? যদি এক্ষণকার শিক্ষাস্রোত ও তরিবদ ফিরাইতে পার, যদি বর্ত্তমান সমাজকে চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে লইয়া যাইতে পার, তবে ত আবার আধ্যাত্মিক পরিবার গঠনের কাল উপস্থিত হইতে পারে, নহিলে নহে। ন মন তেল ও পুড়িবে না, রাধাও নাচিবে না। রসো, আগে যবন রাজত্ব যাক্, যাবনিক শিক্ষা উঠিয়া যাক্, লোকে ব্রহ্মচর্য্য, সংসার ধর্ম্ম, ও বানপ্রস্থাবলম্বী হউক, আগে ইংরাজী বুট পায়ে দিয়া সাহেব সাজা, বেথুন ইস্কুলের গাড়ী চড়া, ইংরাজী খানা খাওয়া, রাধাবাজারে যাওয়া, ইংরাজের পদলেহন করা, হ্যাট্‌কোট পরা, টেলার শপ করা, হোটেল করা, বি এ, এম, এ পাশ করা এবং বিলাত যাওয়া উঠিয়া যাউক, তবে ত আধ্যাত্মিক কাল উপস্থিত হইবে। হা অদৃষ্ট! সে কাল কি আর কখন আসিবে!

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

প্রভাত সঙ্গীত।

১

জাগ মা জননি, ভারতের লক্ষ্মী
মিল আঁখি একবার।

প্রভাত হয়েছে জেগেছে সংসার
নাহি আর অন্ধকার।
জাগ মা জননি, আর্য্যকুল-লক্ষ্মী
হের পোহাইল নিশি।

গগনে জাগিল গগনের রবি
আলোকে পুরিল দিশি।
জগৎ হেরিল, জগতের দিবা,
ভারতের দিবা তুমি,
তুমি না জাগিলে জাগিবেনা এবে
নিদ্রিত ভারত ভূমি।

২

কি কহিব হায় আজি এ ভারত
পড়িয়া মহীর কোলে!
কত শত বর্ষ রিপু পদাঘাতে
যাই নি মা রসাতলে।
জীবিতে যা ছিল, এবে তাই আছে,
মেঘের আড়ালে শশী।
একটীআলোক, যাইনি কো নিবে,
একটী পড়ে নি খসি।
সৌন্দর্য্যের রেখা যেখানে যা ছিল,
স্মৃতি আছে পরশিয়া।
যে শোভা যেথায়, করিত বসতি
আছে যেন ঘুমাইয়া।
কেবল অশান্তি ঘিরিয়া চৌদিক,
ধর ধর তারে করে।
রূপের সম্ভ্রমে পারে না ছুঁইতে,
মেঘ যথা শশধরে।

৩

কত অলঙ্কার, স্বর্ণ অঙ্গে ছিল,
কিছু নাই আর তার!
যে এল নিকটে, সেই নিল কেড়ে
দেহ মাত্র এবে সার!
মিত্র বেশে আসি, দস্যুবেশ ধরি,
নিল সব অপহরি।
নীরবে কাঁদিল, কেহ না জানিল,
কি যাতনা মরি মরি!

মস্তকের মণি, কাণের কুণ্ডল
হাতেতে নাহি বলয়।
হায় রে বিধাতা এত নিষ্ঠুরতা
তোমার এ রাজ্যে সয়!

৪

কত কাল গেল, হায় এই দশা,
তবু ও ভুলেনা লোক!
দলে দলে যাত্রী, শত্রু মিত্র বেশে
জাগাইছে মহাশোক!
এনেছে আঁধার আলোক ভাবিয়া
দেখিতে সৌন্দর্য্য তার।
আপন আলোকে অন্ধ আপনারা
কি দেখিবে বল আর!
আসিয়াছে ঐ ধর্ম্ম, সত্য, নামে
ফিরিতেছে দ্বার দ্বার।
বরিষার কালে নিশার আকাশে,
ঝিকি মিকি অন্ধকার।
এসেছে সভ্যতা, এসেছে বিজ্ঞান,
কথকতা করে তারা।
হায় রে অদৃষ্ট! জ্ঞানের জননী
রহিয়াছে জ্ঞান-হারা!
যাহার শিক্ষায় দীক্ষিত জগৎ
এদুঃখ বলিব কারে!
তাহার সন্তান পূর্ণ-শিক্ষা তরে
যায় গো সমুদ্র পারে!

৫

জাগ মা, জননি ভারতের লক্ষ্মী
মিল আঁখি একবার।
প্রভাত হয়েছে জেগেছে সংসার
নাহি আর অন্ধকার।
চারিদিকে শুন, জয়-ধ্বনি হয়,
পূর্ণ মহী কোলাহলে।

উন্নতির পথে চলেছে জগৎ
আনন্দ-সঙ্গীত তুলে।
ভারত-সন্তান দীন দুঃখী হ'য়ে
কাঁদিবে কতই আর!
উন্নতির পথে, তারা কি জননি
হবে না কো অগ্রসর?
দেখ তারা ঐ মিলে ভাই ভাই
হইতেছে এক ঠাঁই।
[হিন্দু মুসলমান পঞ্জাবী পাঠান,
কোন ভেদাভেদ নাই।

তোমার মহিমা, করিছে কীর্ত্তন
জয়ের নিশান তুলে।
উল্লাসে উৎসাহে আনন্দে মেতেছে
আপনা আপনা ভুলে।
উঠ মা জননি লও মা তাদের
স্নেহের সন্তান বোলে।
তোমার পরশে হাসিবে হরষে
সবাই জননী-কোলে।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ।

সমালোচনা।

বিদ্যোদয়।—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল্য বাৎসরিক ২৲ দুইটাকা, ছাত্র পক্ষে একটাকা। এখানি সংস্কৃত মাসিক পত্র। পূর্ব্বে লাহোর হইতে বাহির হইত। এখন ভাটপাড়া হইতে প্রকাশিত হইতেছে। এরূপ ধরণের সংস্কৃত পত্র আর নাই। এখানি যে সকলের আদরনীয় হওয়া আবশ্যক তাহার আর সন্দেহ নাই। বাঙ্গালির সাময়িক পত্রিকার দুর্দ্দশা দেখিয়া বেশ বোধ হইতেছে শাস্ত্রী মহাশয়কে ইহার প্রায় সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করিতে হয়। এ রূপ পত্রিকার ভার আমাদিগের বহন করা কর্ত্তব্য। বিদ্যোদয় যে একখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাসিক পত্র তাহার আর সন্দেহ নাই।

চিন্তাপ্রবাহিণী; প্রথম ভাগ। শ্রীপ্রিয়নাথ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। তিনখানি পত্রেই প্রথম ভাগ সমাপ্ত। প্রথম পত্রখানি "প্রেম বিষয়ক প্রথম পত্র"। সরোজকুমার প্রমদাচরণকে অনেক লিখিয়া শেষ পত্রে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ভালবাসা কি প্রকার। "সহজাত কি পরের নিকট শিক্ষণীয়? উহা কিকি প্রকারে উদ্রিক্ত হয় ইত্যাদি বিষয়" প্রমদাচরণ তদুত্তরে তাঁহাকে অনেক লিখিয়া পরিশেষে লিখিলেন "যে কারণে দেবাদিদেব মহাদেব ও দেবী ভগবতী দাম্পত্যাদি প্রেমাস্বাদন করিয়া বিশ্বপ্রেমিক ও বিশ্বপ্রেমিকা হইয়াছেন, সেই কারণে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল টেলর পত্নীর সহ ও টেলর পত্নী মিলের সহ এবং অন্যান্য ব্যক্তি দাম্পত্য সুখাস্বাদন করিয়াও বিশ্বপ্রেমিক হইয়াছেন। আমি এই প্রকার সকল লোককে বিশ্বপ্রেমিক হইয়া বিশ্বপ্রেমিকা স্ত্রীর সহিত ও বিশ্বপ্রেমিকা বিশ্বপ্রেমিকের সহ দাম্পত্যপ্রেমসুখ লাভ করিতে অনুরোধ করি।"

লেখক জনষ্টুয়ার্ট মিলকে শিবতুল্য বিশ্বপ্রেমিক বলেন ও টেলরপত্নীকে ভগবতী সদৃশা বিশ্বপ্রেমিকা বলেন। অন্যান্য ব্যাক্তিরাও বিশ্বপ্রেমিক এবং বিশ্বপ্রেমিকা হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে জগতে বিশ্বপ্রেমিক ও বিশ্বপ্রেমিকা ছড়া-ছড়ি। আমরা বলি মিলের মত বা টেলর পত্নীর মত বিশ্বপ্রেমিক বা প্রেমিকা অনেক কলিকাতার গলি খুঁজিতে আছে কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেব কিম্বা দেবী ভগবতীর ন্যায় বিশ্বপ্রেমিক বা প্রেমিকা জগতে অতি বিরল। প্রকৃত বিশ্ব-প্রেমিক এ জগতে নাই।

তারপর "স্বাধীন চিন্তা বিষয়ক দ্বিতীয় পত্র।" এ পত্রখানি সরোজকুমার প্রমদাচরণকে লিখিতেছেন। পত্রখানি মন্দ নয়।

"তৃতীয় পত্র (পীড়িতা লিখিত) এই খানিতেই পুস্তক সমাপ্ত হইয়াছে। এ পত্র খানি পড়িলে হরিভক্তি উড়িয়া যায়। কৃষ্ণা বাইয়ের কথা মনে পড়ে। লিখিতেছেন ;— "আমার জ্ঞানে যে কার্য্যে আত্ম সুখ লাভ হয় তাহাই মানবের কার্য্য, তাহাই মানবের করণীয় এবং যে কার্য্যে আত্মসুখ লাভ না হয়, তাহাই মূল্যহীন, তাহাই মানবের অকার্য্য তাহাই মানবের বর্জ্জনীয়।" ভিন্ন লোকের ভিন্নরূপে আত্মসুখ লাভ হয়। যাহা ইচ্ছা তাহা করিলেই যথেচ্ছার হইল। ইহার জন্যই সমাজ—ইহার জন্যই পেনাল কোডের সৃষ্টি। এ পত্র খানি প্রকাশ না করিলেই ভাল ছিল। এরূপ কথা কেন বলিতেছি তাহার নমুনা স্বরূপ আর এক স্থল উদ্ধৃত করিলাম।

"ভাই! বিবাহের বহুদিন পরে যে দিন তোমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া শ্বশুর-বাড়ী আসিলাম, সেই দিনই আমার সুখের দিন গত হইয়া দুঃখের রাত্রি উপস্থিত হইল। বিবাহকালে আমি স্বামীকে বৃদ্ধ দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তখন জানিনা যে ঐ বৃদ্ধই আমার জীবনের সহচর হইবেন। যিনি পিতার তুল্য, তাঁহাকে স্বামী বলিয়া ভাবিতে হইবে ইহা আমি তখন বুঝিতে পারি নাই. জানিলে এইরূপ আকস্মিক দুঃখে আক্রান্তা হইব কেন?

সপ্তদশ-বর্ষবয়স্কা যুবতীর ষাটি-বর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ স্বামী দেখিয়া আমি কাঁদিলাম; অবশেষে কপালের বিধি খণ্ডাইবার নয় ভাবিয়া বৃদ্ধ স্বামীর সহিত মন মিলাইতে বহু চেষ্টা করিলাম; কিন্তু হায় কিছুতেই মন মিলিল না।"

তারপর পত্রে লিখিতেছেন। "আমি একটি যুবককে বেড়াইতে দেখিলাম। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল তাঁহার মনটি যেন আমার মনের মত। বোধ হয় যুবকও আমাকে দেখিয়া ভাবিতেছিলেন তাঁহার মনের মত আমার মন, কারণ তিনি আমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া আমার দিকে বারংবার হাসিমাখান দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। আমিও তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ঘোমটার ভিতর হইতে হাসি লজ্জা মাখান দৃষ্টি ঘন ঘন নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম।" ইত্যাদি ইত্যাদি। একজন শিক্ষিতা মহিলা পূর্ব্ব পরিচিত বাল্য সহচরের নিকট এইরূপ ভাবে পত্র লিখিয়া আত্ম পরিচয় দিতেছেন। স্ত্রী শিক্ষার যদি এইরূপ ফল হয় তাহা হইলে স্ত্রী শিক্ষা একেবারে উঠিয়া যাউক। বাল্য সহচর বা কিরূপ তাহা আমরা বলিতে পারি না; কারণ এরূপ গুপ্ত চিঠি তিনি জন সাধারণে প্রচার করেন। চিন্তা প্রবাহিণীর এই শেষ প্রবাহিণী।

চিন্তা প্রবাহিণীর লেখক যে ভাবুক তাহার কোন সন্দেহ নাই। চিন্তাশক্তিরও পরিচয় স্থানে স্থানে দিয়াছেন। ভবিষ্যতে আমরা ইহা অপেক্ষা যে অনেক পরিমার্জ্জিত ও উৎকৃষ্ট উপহার তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইব—এরূপ আমরা আশা করি।

পত্রিকা। আমরা ইহার প্রথম তিন সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রিকাখানিতে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসুর রসময়ী-লেখনী-প্রসূত "শান্তির" সমালোচনটি অতি সুখপাঠ্য"। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "জাতিভেদ" প্রবন্ধটিতে অনেক নূতন কথা আছে। * * * * পত্রিকাখানি যে ভাবে চালিত হইতেছে, তাহাতে ইহার নিকট অনেক আশা করা যায় কিন্তু পোড়া বঙ্গদেশ আজিও ভাল জিনিষের আদর করিতে শিখে নাই, সুতরাং কার অদৃষ্টে কি ঘটে জানি না"।

সুরভি ও পতাকা। ২৯শে পৌষ, ১২৯৪ সাল।

"আমরা "বিভা নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। বিভা পাঠ করিয়া আমরা নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। ইহার লেখা নিতান্ত সরল ও প্রাঞ্জল এবং ভাবও হৃদয়-গ্রাহী। বিভা যেরূপ ভাবে চলিতেছে, এরূপ ভাবে চলিলে ইহা একখানি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্র মধ্যে পরিগণিত হইবে। দুঃখের বিষয় এই যে, পোড়া বাঙ্গালাদেশে ভাল জিনিষের আদর নাই। যদি বাঙ্গালী প্রকৃত বাঙ্গালার আদর করিতে শিখিয়া থাকে তবে "বিভার" বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করিত।" বিজলি

"ইহা একখানি মাসিক পত্রিকা। বিগত আশ্বিন মাস হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে। এ পর্য্যন্ত আমরা চারি সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমারা ইহার যে অংশ পাঠ করিয়াছি, তাহাতেই মুগ্ধ ও প্রীত হইয়াছি। যে কয়েকজন লেখক বর্ত্তমানে বঙ্গ সমাজে অলঙ্কার রূপে গণ্য, তাহাদের মাধুরীময়ী লেখনীই ইহাতে স্থান পাইয়াছে। বিভা যে বঙ্গসংসারের প্রতিভারূপে সকল সুহৃদয়বান্ ব্যক্তির আনন্দবিধান করিবে; সকলের অজ্ঞানান্ধকার নিজজ্যোতিতে আলোকিত করিবে; সকলের শাস্ত্রান্ধ ও ধর্ম্মান্ধনয়নে যে দৃষ্টিশক্তি বিধান করিবে, ইহা আমাদের আশা হয়। ইহার তৃতীয় সংখ্যার লিখিত শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র বসু মহাশয়ের আদর্শ ইতিহাসশীর্ষক প্রস্তাব অতিশয় দূরদর্শিতার ও আধ্যাত্মতত্ত্বের পরিচয় দিতেছে। যাঁহারা রামায়ণ ও মহাভারতের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে চাহেন, তাঁহাদের উচিত এই প্রস্তাব একমনে পাঠ করা। শ্রীযুক্ত রজনী বাবুর সিপাহি বিদ্রোহে বৃটিশনীতি অতি সুন্দর বিবৃত হইতেছে। শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ও ইহাতে বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় লিখিয়া ধর্ম্মজীবনের গঠন শিক্ষা দিতেছেন। যাহা হউক আমরা এরূপ উত্তম পত্রিকার বহুলপ্রচার ও দীর্ঘজীবন আশা করি।

... ... হিন্দুধর্ম্ম ১৫ই মাঘ ১২৯৪ সাল।

" বিভা। " মাসিক পত্রিকা। ইহার শিরোনামে সম্পাদকের নাম নাই। শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ ইহার প্রকাশক। আমরা ক্রমে ইহার চারি সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। কোনও আড়ম্বর নাই, জাঁকযমক নাই, কোনওরূপ সাড়া শব্দ কিংম্বা বাক্যব্যয় নাই, উষার প্রফুল্ল বিভা যেমন আপনি আসিয়া পূর্ব্বদিকের আঁধার মুখে হাসির রেখা আঁকিয়া দেয়। চারিদিকে কুসুমের সুবাস ছুটিতে থাকে, মৃদুমন্দ সমীরণ প্রবাহিত হয়, একটি

একটি করিয়া জীবকুল জাগৃত হইয়া উষার সেই ক্রমোজ্জল বিভার মুখ দেখিয়া প্রীত ও প্রফুল্ল হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য-সংসারে এই নবোদিত বিভাও তেমনই বিনা আড়ম্বরে উদিত হইয়া ধীরে ধীরে লোকের মন ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়া লইতেছেন। ইহার লেখা সাধারণতঃ সরল, মধুর ও ভাবুকতার পরিচায়ক। প্রবন্ধগুলি প্রায়শই সারগর্ভ ও উপাদেয়। আমরা আশা করি, বিভারশ্মির পর রশ্মিসংযোগে ক্রমশঃও উজ্জ্বলতম অথচ চন্দ্রমার ন্যায় সুখস্পর্শ হইয়া বাঙ্গালীর আদরের সমগ্রীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

সারস্বত পত্র। ১৫ মাঘ।

মূল্য প্রাপ্তি।

নাম	ঠিকানা		টাকা
শ্রীযুক্ত আশুতোষচট্টোপাধ্যায় ...	বেরেলি		২৸০
„ প্রিয়নাথ দাস ...	পারবালী পোঃ গোপিগঞ্জ ...		১৲
শ্রীশ্রীদিহিঙ্গ ছত্রাধিপতি বিনন্দচন্দ্র গোস্বামী ...	নওগাং, আসাম		২৸০
স্বাধীন রাজা সুধল দেব বাহাদুর	রামরা সম্বলপুর		২৸০
রাজা শ্রীবিরেশ্বর রায় ..	তাহেরপুর		২৸০
শ্রীযুক্তঅক্ষয়কুমার বসু ...	রালিব্রাদাস অফিস কলিকাতা ...		২৷০
„ অক্ষয়চন্দ্র ঘোষ ...	দরজিপাড়া	ঐ ...	২৷০
„ মন্মথনাথ দে ...	বাগবাজার	ঐ ...	২৲
„ পাঁচকড়ি বিশ্বাস ...	মহেন্দ্র বসুর লেন	ঐ ...	২৷০
„ অন্নদাপ্রসাদ দে ...	নবীন সরকার লেন	ঐ ...	২৷০
„ পূর্ণচন্দ্র রায় ...	আহিরীটোলা	ঐ ...	২৷০
„ যোগেন্দ্রনাথ পালিত ...	তালতলা	ঐ ...	২৷০
„ কৃষ্ণচন্দ্র বসু ...	শ্যামবাজার	ঐ ...	২৷০

কলিকাতা,
৭৮ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট নিউ বৃটানিয়া প্রেসে,
শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।